অড় গু=অড়ঙ্গু। সংস্কৃত 'শুনকঃ' (=কুকুর) তামিল ভাষায় হয় 'শুণঙ্গন্' ও 'শোণঙ্গি'। আ+ডু=আঙু (=সেখানে, সে সময়ে)। অ×গু=অঙ্গু (=সেখানে)। 'পগু' স্থানে 'পঙ্গু' (=অংশ, ভাগ) উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। আমাদের ভাষায়ও এই প্রকার অতিরিক্ত অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ বিরল নহে। উদাহরণ ঘোটক—ঘোঁড়া; অক্ষি—আঁখি; কক্ষ—কাঁখ; কাচ—কাঁচ; বাস—বাঁস; কোরক—কুঁড়ি, কোঁড়া; ইষ্টক—ইঁট; স্ফোটক—ফোঁড়া; উচ্চ—উঁচু, শস্য—শাঁস; বক্র—বাঁকা। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেই এ উচ্চারণ আরম্ভ হইয়াছে। ইরাণীয় জেন্দ্ ভাষায়ও এই প্রকারের একটা দেখা যায়, তাহাতে অনাদি দন্ত্য 'স' বর্ণের হকারে পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে একটা অতিরিক্ত অনুণাসিক বর্ণের আমদানি হয়। উদাহরণ—নাসত্য—নাওংহইথ্য, বসু-বংহু; শকাসঃ (বৈদিক)—শকাওংহো; বসনম্—বংহনেম্ (vanha-nem), অবসঃ—অবংহো; ইত্যাদি। সর্ব্বত্র কিন্তু এ নিয়ম খাটে না; অসুর—অহুর; ভরসি—বরহি। *

দুইটী স্বরবর্ণ একই পদের মধ্যে একত্র থাকিবার বাধা না থাকিলেও দ্রাবিড়ী ভাষায় স্বরদ্বয়ের মধ্যে 'য', 'ব', 'ন', বা 'ম' এই চারিটী বর্ণের কোনও একটীর ব্যবহার হইয়া থাকে। পালি ভাষায়ও এ নিয়ম আছে। * তামিল ভাষায় তালব্য স্বরের পর 'য়্' ও অন্য স্বরের পর 'ব' হয়। বর+ইল্লেই=বরবিল্লেই (আসে নাই, অনাগত, not come), বরি+অল্ল=বরিয়ল্ল (রাস্তা নহে, (it is not the way), অন্যান্য বর্ণের আগম এ ভাষায় নাই। সুতরাং অন্যান্য দ্রাবিড়ী ভাষার কথা এখানে আলোচ্য নহে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও আমরা অনুরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি। আমাদের 'হ' ধাতুর পর 'আ' প্রত্যয়

---

* ১৩১৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ২য় খণ্ডে বঙ্গভাষার অনুনাসিকতা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তখন তামিল ভাষার এ বৈশিষ্ট্য জানিতাম না।

* "যবমদন তরলা চাগমা। কচ্চায়ন ১।৪।৬। সরে পরে যকারো বকারো মকারো দকারো নকারো তকারো রকারো লকারো ইমা আগমা হোন্তি।" উদাহরণ যথা×ইদং=যথয়িদং,ভন্তা×উদিক্খতি=ভন্তাবুদিক্খতি, লহু×এস্সতি=লহুমেস্সতি, সম্ম+অঞ্ঞা=সম্মদঞ্ঞা, ইতো আয়াতি=ইতোনায়াতি, যস্মা+ইহ=যস্মাতিহ, আরগ্গে×ইব=আরগ্গেরিব, ছ+আয়তনং=ছলায়তনং। সংস্কৃতেও এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উদাহরণ—সখ আগচ্ছ, সখয়াগচ্ছ; প্রভ এহি, প্রভবেহি; স্ত্রিয়া অর্থঃ, স্ত্রিয়ায়র্থঃ; রবা অস্তমিতে; রবাবস্তমিতে; অ ঐক্য=অনৈক্য।

করিলে উভয় স্বরের মধ্যে বকারাগম হয় না বটে, কিন্তু বকারের উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণ ওকার দ্বারা লক্ষিত হয়, যেমন 'হওআ' বা 'হওয়া'। প্রাকৃত 'ইঅ' প্রত্যয় বাঙ্গালায় 'ইয়া' হয়, যেমন 'করিয়া', 'যাইয়া'। প্রাকৃত ভাষাতেও এ উচ্চারণ দেখা যায় এবং জৈন-প্রাকৃত বা জৈন ধর্ম্মগ্রন্থাদির ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী 'য়' উচ্চারণ 'য-শ্রুতি' নামে পরিচিত। নেতিবাচক 'অ' উপসর্গ ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না বটে, কিন্তু স্বরবর্ণের পূর্ব্বে বাঁধ দিবার জন্য একটা নকারকে ডাকিয়া আনে। এইরূপ নকারের উচ্চারণ সংস্কৃত, জেন্দ ও গ্রীক ভাষায় হইত। অন্যান্য আর্য্য ভাষায় নকারের লোপ হইত না। এই লইয়া Bragmann এর বিখ্যাত Sonant nasal theory.

যতই আলোচনা করা যায় ততই এ বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায় অথচ প্রবন্ধের কলেবর বিপুল হইয়াছে। সুতরাং আমরা বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

যুগ-পথ।

[শ্রীভোলানাথ সাহা]

মহা মিলনের মন্ত্রসাধন উৎসবে
আজ্ জুট্ সবে—
ল'য়ে প্রাণের বিপুল বেদনায় ভরা আঁখি,
সয়ে সব জ্বালা সব কর্ম্মের মাঝে থাকি,
শোন্ সঙ্গীত,
দেখ্ ইঙ্গিত
করে রক্তিম রোষে শক্তিময়ী যে "স'রে যা ভণ্ড, কুট সবে,
আয় সরল, প্রেমিক সাধকেরা আয় আমার প্রসাদ লুট সবে।"
এযে শান্তি যুদ্ধ—
চিত্ত শুদ্ধ—
ধর্ম্মের প্রসারণ;
এযে 'মা' ব'লে ডাকা, বুক পেতে থাকা, অন্যথা অকারণ।

এযে জ্ঞানের সাগরে হাবুডুবু, শিরে শান্তির বারি ল'য়ে ;
এযে অকুলের কোনে আলোকের আভা এতকাল র'য়ে র'য়ে ।
ওরে যুগের প্রভায় আজ্
প্রভাময় হ'য়ে ভারত আজিকে পরিয়াছে শিরে তাজ—
বোবা, কালা যত শোনে, কথাকয় ।
কাণা, খোঁড়া যত দেখে খাড়া র'য় ।
অভাবুক যত হয় ভাবময়
স্বাধীনের পরে সাজ ।
বাজে পরাধীন হ'য়ে প'ড়ে থাকা বুকে বাজের অধিক লাজ ।
ওই, দুর হ'তে ডাকে কে ?
অমৃতের বাণী গুরুগম্ভীরে কর্ণে পশিল রে ।
শোন্ শোন্ ওই শোন্,
এখনো ধ্বনিছে শোন্—
জননীর খাসা প্রাণময়ী ভাষা এখনো ধ্বনিছে শোন্—
"সৃষ্টির সেরা মানব যে তুমি ছাড় সৈনিক-সাজ,
শক্তি আজি যে সাধনার পথে, হত্যা নহে তো কাজ ।"
প্রাণ খুঁজে নে রে ওরে মহাপ্রাণ,
ছাড়্ রে হিংসা, রাখ্ রে কৃপাণ,
হৃদয়ের বলে হ'রে আগুয়ান্—অদম্য, নির্ভয় ;
সত্যের গূঢ় শক্তির বলে সয়তানে কর জয় ।
যে কহে—"অস্ত্র আন্,
ভায়ের বক্ষে হান্"—
মিত্র সে নহে, মান্য সে নহে, হোক শত বলবান্ ।
নর-আত্মায় গড়িতে যে চায় পশুর অধম করি,
আপন স্বার্থে অন্যের প্রাণ পাপে দিতে চায় ভরি,
তার উপদেশ না করি পরখ্
দু'হাতে বিলায়ে মৃত্যু, মড়ক
বরি ল'বে কি অনন্ত নরক পরকালে তার ফলে ?
অমর আত্মা মরণের বর মাগিবে যে পলে পলে ?
তুই কেন র'বি দুরে ?

আজি মার বন্দনা এ মহাজাতিরে মিলাইল একসুরে।
ক্ষুধা নাই, তবু অছিলায় তার
বিষপান ক'রে নিদ্ যান কার?
অন্তরে দেখ্ আছে অভয়ার বরাভয় রূপ জুড়ে;
(তুই) রুগ্ন মনের দুষ্ট ক্ষুধায় য়াস্ শুধু জলে পুড়ে।
ওরে সন্তান! আজ সব তান ধর্।
এক তান কর্
সব তানে,
ছাড়্ ভাণ, তোর যাক্ প্রাণ তবু
চল্ মহাবল—
সন্ধানে।
ভগবান্! আজি ভক্তির মাঝে শক্তি বিতর মন্-প্রাণে,
ভাষা দাও যাতে ভেসে যায় দেশ,
ভাব দাও যাতে ভেবে পায় শেষ,
জ্বালা দাও যাতে জ্বলে মোহ, দ্বেষ—
সবে কয়—"এই পন্থা নে"—
তব 'পাঞ্চজন্য' মিলায় সিদ্ধি ত্রিংশ কোটি সন্তানে।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাষা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

ভাষা কি—ভাষার উৎপত্তি—ভাষা ও জাতি

পরস্পরের মনোগতভাব বিনিময় করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় মানুষ অবলম্বন করে তাহাকেই ভাষা বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত প্রবর টাইলর বলিয়াছেন—উচ্চারিত ধ্বনিবিশেষের সহিত সাধারণত সংশ্লিষ্ট ভাবের প্রকাশ ক্রিয়া ভাষা দ্বারা সাধিত হয় (the expression of ideal by means of

articulate sounds habitually allotted to those ideas)। ভাষা উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু সমস্ত উচ্চারিত ধ্বনিই ভাষা নয়—কারণ তাহার ভিতর ভাব না থাকিতেও পারে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কেত, চিত্র, গ্রন্থিযুক্ত রশি কিম্বা নানারূপ রঙ্ অথবা অন্যান্য অনেক প্রকারে কৌশল ব্যাপকভাবে ভাষা কাজ করে বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

হাত, চোখ, মুখ প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা আমরা অনেক সময় অনেক ভাব প্রকাশ করি। ভিন্ন ভাষা ভাষী দুইজন লোকের প্রথম ভাব বিনিময়ের চেষ্টায় এই জাতীয় সঙ্কেতের বাহুল্য দেখা যায়। মিশর প্রভৃতি দেশে চিত্রের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হইতে—ক্রমে এই—সমস্ত চিত্র হইতে বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। চীনদেশে একটি ভাববাচক একটি চিত্র বা তাহার অংশ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন মেক্সিকো দেশে গ্রন্থিযুক্ত রশি দ্বারা সংবাদাদি পাঠানো হইত। এখনো সৈন্য বিভাগে Signalling সঙ্কেতের দ্বারা অনেক কাজ করা হয়।

এইরূপ ভাব বিনিময়ের নানা প্রকার উপায়ের মধ্যে ধ্বনি দ্বারা ভাব বিনিময় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া মানুষের ভাষার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। আদিম মানবের পক্ষে দূর হইতে শব্দ করিয়া সঙ্কেত করা প্রশস্ত উপায় ছিল—দৃষ্টির আড়ালে থাকিলেও এই সঙ্কেত সম্ভবপর হইত এবং দূরত্ব বা অন্ধকার ইহাতে কোনও বাধার কারণ হইত না।

ভাষার উৎপত্তি কি প্রকারে হইল তাহা ঠিক করা এক প্রকার অসম্ভব। নানা মুনির নানা মত এ বিষয়ে চলিয়াছে। কোনটাই ঠিক নহে, অথচ সকল গুলিই কতক কতক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করে। বেদে এবং বাইবেলে ভাষায় দৈবী উৎপত্তি (Divine origin) সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পণ্ডিত প্রবর যেস্‌পার্‌সেন্ (Jesprsen) বলেন— আদিমানব প্রেমের নৃত্যগীত করিতে করিতে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। গানের সুরের মধ্য দিয়াই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—এবং শব্দগুলি ক্রমশ বিভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আচার্য্য ম্যাক্‌সমূলর কতকগুলি মজার থিওরি করিয়াছেন। ইংরেজীতে এইগুলির নাম্ দিয়াছেন—Bow-wow, Pooh pooh, ding dong, ye-ho-ho। আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর bow wow theory বাঙ্গলা করিয়াছেন—"ভেউ ভেউ" বাদ। অন্যান্য তিনটি থিওরির নাম আমরা যথা ক্রমে থুথু, ঢংঢং এবং হেঁইয়ো হেঁইয়ো বাদ দিব। ভেউ ভেউ বাদের দ্বারা কতকগুলি শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় যেমন— ম্যাঁও (বিড়াল), ঝুম ঝুমি (এক প্রকার

খেলনা) ঘুঘু .(অনুরূপ শব্দকারী পক্ষী বিশেষ) ইত্যাদি। থুথু বাদের উদাহরণ—ছ্যা ছ্যা, ফ্যা ফ্যা, ইত্যাদি।

ঢং ঢং বাদের উদাহরণ :—টগ্ বগ্, টক্ টক্ টক্, আঁকা বাঁকা ইত্যাদি—

হেঁইয়ো হেঁইয়ো বাদের উদাহরণ :— পাল্কী বেয়ারার হুঁহুঁ ইত্যাদি

ভেউ ভেউ ও ঢংঢং বাদের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে প্রথমটিতে শব্দ অনুসারে নামকরণ হয়, এবং দ্বিতীয়টিতে শব্দ হইতে ভাবের ধারণা মনে আসিয়া পড়ে। ঝুম্ ঝুম্ শব্দ করে বলিয়া খেলনা বিশেষের নাম ঝুমঝুমি হইল, আর টগ্ বগ্ কথাটি কোনও জিনিসের নাম হইল না বটে কিন্তু ভাত প্রভৃতি ফুটিলে কিরূপ শব্দ হয় তাহার একটা ধারণা কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে আনিয়া দিল।

ম্যাক্সমূলের এই সব থিওরি এখন বিশেষজ্ঞগণ হাসিয়া উড়াইয়া দেন। য়েস্পার্সেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রোমানেসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে মানুষের ভাষা সৃষ্ট হইবার ঢের পরে কুকুর মানুষের পোষ মানিয়াছিল। কুকুর ভেউ ভেউ করিত বলিয়া তাহার নাম "bow wow" হইল ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা নয়। যাহা হউক এই কয়েকটি থিওরি হইতে ভাষার গোটা কয়েক মাত্র শব্দের উৎপত্তি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট রাশি রাশি শব্দ কোথা হইতে আসিল; ভাষা বিজ্ঞান এখনও ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। পণ্ডিতগণ কেবল মাথা ঘামাইয়া রাশি রাশি থিওরি আওড়াইতেছেন মাত্র। এ মূল তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে কিনা কে জানে।

ভাষা এবং জাতির কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে একজাতি হইলেই এক ভাষা হইবেই আর এক ভাষা হইলেই এক জাতি হইবে। ইহার কোনটাই সত্য নয়। জন্মের সহিত যেমন কেহ লিখিতে পড়িতে শিখে না, সেইরূপ ভাষাও শিখে না। ভাষাকেও চর্চ্চা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। বাঙালীর ছেলে যে একজন ইংরেজের ছেলের চেয়ে সহজে বাঙলা শিখিবে এমন নয়। অবশ্য পারিপার্শ্বিক উভয় ক্ষেত্রেই সমান অবস্থার হওয়া চাই। যদি ছেলেটিকে একবারে নির্জ্জনে রাখা যায় সে কিছুই শিখিবে না।

তবে জাতির চিন্তা করিবার ধরণের সঙ্গে ভাষার কিছু সম্বন্ধ আছে। এবং এই সম্বন্ধটা সহজে যায় না। যখন এক জাতি অপর একজাতির ভাষা গ্রহণ করে তখন তাহার চিন্তাপদ্ধতি অনুযায়ী সে ভাষাকে খানিকটা বদলাইয়া লয়। আমেরিকার নিগ্রোরা তাহাদের ইংরেজীকে নিজেদের ভাবাপন্ন করিয়া

লইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত যাবতীয় প্রচলিত ভাষাগুলির বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির (syntax) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

ভাষার সমস্ত শব্দ বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভাগবত এই কাটামোখানা সহজে বদলায় না। আধুনিক পারস্য ভাষার শব্দ সমূহ অধিকাংশই আরবী হইতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহা মূলত আর্য্যভাষার ভাবিবার ধরণ —বজায় রাখিয়াছে এবং আরব্য প্রভৃতি সেমেটীক ভাষা হইতে আর্য্যভাষার বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির যে প্রভেদ তাহা কতকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। ভাষার জাতি বিভাগের সময় এই ভাবগত সাদৃশ্যই প্রধান লক্ষণ।

কুচবিহারের কোচেরা তিব্বতি মঙ্গোলীয় নামক মানবজাতির শাখাবিশেষের বংশধর। কিন্তু তাহারা আর্য্যভাষা বাঙ্‌লাকে কথিত ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে। রক্তের সংমিশ্রণের সঙ্গে ভাষার সংমিশ্রণ খুবই চলিয়াছে। তবে মূল ধাতটি দেখিয়া ভাষার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। রক্তের সহিত ভাষার কোনও সম্বন্ধ নাই। আয়র্লণ্ডের লোকেরা সকলেই প্রায় ইংরেজী বলে—তাহারা এবং ইংরেজরা জাতি হিসাবে পৃথক—ইংরেজরা Anglo saxon, আইরিসরা Celtic কেল্টিক। এখন আবার আয়র্লণ্ডের প্রাচীন জাতীয় ভাষার পুনরুদ্ধারের খুব চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপে ভাষা বদল হয়। সুতরাং জাতি এবং ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিছুই নাই।

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৩৪)

মধু যতটা বলিল ততটা না হইলেও রাখুর ভাগ্যে কর্ত্তামশায়ের তিরস্কারটা বড় কম হয় নাই।

নির্ম্মলার নিকট হইতে কাপড় ও ছাতি লইয়া প্রথমে সে অপরাপর যজমানদের বাড়ী পূজা সারিতে চলিয়া গেল। নির্ম্মলাদেবীর নিমন্ত্রণে যখন সে না বলিতে পারিল না, তখন সে স্থির করিল সব কাজ শেষ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইবে এবং পূজাশেষে ঠাকুরের ভোগ দিয়া নিমন্ত্রণ সারিয়া

বাসায় ফিরিবে। সেখানে কর্ত্তা মশাইকে ঠাকুরপূজার জন্ত অন্ত কাহাকেও নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া সে কলিকাতা, বোধ হয়, চিরদিনের জন্তই ত্যাগের সংকল্প করিল। সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও, রাখুচারু চারুরাখু এই ভাবটা এমন একটা উন্মত্ত করা ছায়াভাবে তাহাকে অভিভূত করিয়াছে যে, দেশে ফিরিয়া কিছুকাল নির্জ্জনে চক্ষুজল না ফেলিতে পারিলে সে যেন পূর্ব্বরাত্রির সেই স্বপ্নকথা স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিবে না। কলিকাতায় থাকিলে তাহার পা দু'টা হয়ত কোনদিন তাহার অন্তমনস্কতায় তাহাকে চারুর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আবার যাইলে আর কি সে পূর্ব্বরাত্রির সে-জীবনের সেই অভিনব-আস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে? চারুর সে সজল বিলোল দৃষ্টির ভিতর দিয়া তার সেই কিন্নরকণ্ঠের ঝঙ্কৃত মধুগীতির আবেদন—আনন্দের পূর্ণভারে আর কি তার সমস্ত হৃদয়টাকে একটা অপূর্ব্ব উল্লাসকর পীড়নে চাপিয়া ধরিবে! তার প্রাণটা কেবল বলিতেছে চারুরাখু হো'ক। কিন্তু তা হওয়ার সম্ভাবনা সে যে কল্পনার কোনও দিক দিয়া অনুমান করিতে পারিতেছে না! রাখু চারু হো'ক একথা কিন্তু মনের একটা কোণ হইতেও সে উচ্চারিত করিতে পারিল না। গৃহস্থ কন্তা বিশেষতঃ বঙ্গ পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলবধূ এমন হীনব্যবসায় অবলম্বন করিতে কেমন করিয়া এই এতবড় জনাকীর্ণ সহরের ভিতরে আসিবে? যদিই বা এ অসম্ভব সম্ভব হয়, তা সেটা তার স্বামীর কি অপরাধে হইবে? রাখুচারু একথা মনে মনে উচ্চারণ করিতে গিয়াও মৃত্যু নিজে আসিয়া যেন তার গলাটা চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিল।

সে স্থির করিল, পূজাকার্য্যে ইস্তফা দিয়া, শুধু সে দেশে ফিরিবে না, ফিরিয়া বিবাহ করিবে। সে দরিদ্র হইলেও বড় কুলীন। তাহাকে ঘর জামাই করিবার জন্ত ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থান হইতে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল—সে রাজী হয় নাই। সে পল্লীগ্রামে বসিয়া বসিয়া অনেক ঘর জামায়ের দুর্দ্দশা দেখিয়াছিল। শুধু তাই নয়, ঘর জামায়ের পুত্র হওয়ায় যে কি লাঞ্ছনা মামীর নিকট হইতে ব্যবহার পাইয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। সেই জন্য এতকাল সে বিবাহ করে নাই, গান বাজনার চর্চ্চায় এতকাল মনটাকে সংসার হইতে সে উদাস করিয়া রাখিয়াছিল।

এতদিন পরে আবার তাহার বিবাহে ইচ্ছা হইল। বিবাহের ফল যাই হ'ক, না করিলে চারুর স্মৃতিযন্ত্রণার দায় হইতে কিছুতেই সে নিষ্কৃতি পাইবে না।

সে ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, এখানে সেখানে পা ফেলিয়া কোনও রকমে যজমানদের বাড়ীর পূজা সারিতে ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইল। এক ব্রজেন্দ্র বাবু ছাড়া অপর সকল যজমানদের পুজা করিয়া সে একবার বাসায় ফিরিতেছিল। তখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ছাতি লইয়াও সে পরিধেয় বস্ত্রকে ভিজা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে কাপড় পরিবর্ত্তনেরও তার প্রয়োজন হইয়াছিল। বাসাবাড়ীর দ্বারমুখে যেই সে প্রবেশ করিবে, অমনি সে দেখিতে পাইল হেমা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই হেমা কতকটা সঙ্কুচিতের ভাব দেখাইল। রাখু সেটা লক্ষ্য করিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময়েও সে আর একবার হেমার এইরূপ ভাবের মত একটা ভাব দেখিয়াছিল। কিন্তু সঙ্কোচের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পূজার তাগিদ করিতে এসেছ নাকি হেমচন্দ্র ?"

হেমচন্দ্র অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে উত্তর করিল—"হুঁ।"

"বাড়ীতে গিয়া তোমার মাকে বল, আমি যত শীঘ্র পারি যাচ্ছি।"

হেম এ কথার কোনও উত্তর দিতে না দিতে, পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল—"আর তোমাকে সেখানে যেতে হইবে না।"

হেমার পশ্চাতে কিছু দূরে রাখু প্রশ্ন কর্ত্তাকে দেখিতে পাইল। সে কর্ত্তা মশায়ের ঝি। নামে ঝি হইলেও কার্য্যে সে এক রকম বাসার কর্ত্রীই ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ সন্তান সেখানে থাকিয়া পূজারির কাজ করিত, তাহাদের অধিকাংশই তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিত। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যকদের মধ্যে যাহারা এই দাসীর সহিত কোনও সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে নাই রাখু তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু সে তাহাকে যে নামে সম্বোধন করিত, স্বয়ং কর্ত্তামশাই ও একদিনের জন্য তাহাকে সে কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। রাখু তাহাকে বলিত ঝি, কর্ত্তা মশাই দিবসের অধিকাংশ সময় বলিত 'ওগো'। নিতান্ত দূরে থাকিলে কিম্বা চোখের অন্তরাল হইলে কখন কখন নাম ধরিয়া তাহাকে যেন আপ্যায়িত করিত। অবশ্য অনেকেই এই সম্বোধন বাক্যের ভিতর দিয়া কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে এই পরিচারিকার একটা সম্বন্ধের আভাস দেখিতে পাইত। দেখিলেও সে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না।

তার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাখু ভিতরে আর হেমা বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাখু ঝিকে বলিল—"একবারে না আজ ?"

ঝি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"বোধ হয়।"

"কি বোধ হয় ঝি,—আর কি আমাকে কোনও দিন ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী যেতে হবে না।"

"বোধ হয়।"

শুনিয়া রাখুর মুখখানা সহসা মলিন হইয়া গেল, অথচ নিজে সে ঝিয়ের উত্তরের কোনও অর্থ বুঝিতে পারিল না।

ঝি তার মুখ দেখিয়া হাসিল। বলিল—"কেন যেতে হবে না বুঝতে পেরেছ ঠাকুর ?"

"বুঝতে পারিনি ঝি !"

"খুব ন্যাকামি জানত দেখছি। কাল কোথায় রাত কাটিয়েছে মনে নেই ?"

রাখুর মুখ দেখিতে দেখিতে আরক্তিম হইল।

"মনে পড়েছে ?" ঝি হাসির তরঙ্গ রোধ করিতে পারিল না। এই বিদ্রূপ হাসি রাখুকে যেন আরও অপ্রতিভ করিয়া দিল।

ঝি বলিতে লাগিল—"ভিজে বেরালটির মত থাক, ওমা, তোমার ভেতরে এত ছিল !"

রাখু এখনও কোন উত্তর দিতে পারিল না কোনও কথা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। একবার অন্যমনস্কের মত পিছনে চাহিতেই দেখিল হেমা আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে।

রাখুর সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই হেমা সন্ত্রস্তের মত সরিয়া গেল।

তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না দেখিয়া কথায় এইবারে অনেকটা করুণার সুর বাঁধিয়া ঝি বলিল—"গরিবের ছেলে, দু পয়সা রোজকার করতে কলকেতায় এসেছ, এমন বোকামিও করে ! কলকেতা সহর—আমোদ করবার কি আর জায়গা ছিল না, তাই বেছে বেছে বাবুর মেয়েমানুষটির ঘরেই ঢুকেছ ?"

রাখু এইবারে বুঝিল—পূর্ব্বরাত্রির কথা তার মনে পড়িল—সে তবে ব্রজেন্দ্র বাবুরই রক্ষিতার গৃহে আশ্রয় পাইয়া সারারাত পরম আনন্দে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে !

"তুমি কি মনে করেছ ঝি ?"

সে বয়সে হাসিকে যতটা কোমল মধুর করিবার করিয়া ঝি উত্তর করিল—

"আমি ত যা মনে করবার করেইছি, আর পাঁচজনে আরও কত রকম মনে করেছে, যারা তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখেছে।"

রাখুর মাথাটা অবনত হইল। সেই ঝঞ্ঝাগর্ভ ঘনতমসার রাত্রি চারুর সঙ্গে তার মধুর মিলনের এত সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিল?

ঝি তার অবস্থা দেখিয়া কতকটা ক্ষুণ্ণ হইল। রাখুকে আশ্বস্ত করিতে সে বলিল "যা হ'য়ে গেছে তার জন্ত ভেবেত কোনও ফল নেই। কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা কর। বুড়ো যা বলবে সব কথা কাণে তুলোনা। আমি এখনি ফিরে আসছি। এসে যা বলতে কইতে হয়, আমিই বলব, তুমি কোনও উত্তর ক'র না। বলিয়াই ঝি চলিল। চলিতে চলিতে একবার মুখ ফিরাইয়া যখন সে দেখিল, রাখু পাথরের মূর্ত্তির মত ভূমির উপরে নিরর্থক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া এখনও সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, তখন নারীসুলভ স্নেহোচ্ছল কথায় তাহাকে বলিয়া উঠিল—"পুরুষমানুষ, কিসের লজ্জা এত তোমার? যাও বুড়োর সঙ্গে দেখা কর। আর, না পার, আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কর। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী আর যেতে না পাও, কলকেতায় কি আর পূজো করবার বাড়ী নেই। তবে বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা করবার প্রয়োজন নেই। বাঁয়া তবলা বিছানায় গড়াগড়ি দেখে রাগে সে একবারে আগুন হ'য়ে গেছে। তুমি গরীবের ছেলে, সে বড়লোক। টাটকা রাগ হঠাৎ একটা অপমান ক'রে বসতে পারে।" বলিয়া আরও দুই চারিটা আশ্বাসের কথা তাহাকে শুনাইয়া কি বলিয়া গেল।

মাথা হেঁট করিয়া রাখু ব্রজেন্দ্র সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিল। ঝির মুখে ব্রজেন্দ্রের নাম সেটা আরও প্রখর করিয়া তুলিল। সে মনে করিতেছিল ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করিবে, তাহাকে সমস্ত ঘটনার কথা সরলভাবে বলিবে। কলিকাতা ত্যাগ ত সে করিবেই—চোরের মত ত্যাগ করিবে কেন? ঝির কথায় বুঝিল, বাবুর সঙ্গে দেখা করায় অপমান ভিন্ন তার অন্যলাভ ঘটিবে না। চরিত্রগত দুর্ব্বলতায় বাবু ত সবল চোখে তার নিষ্কলঙ্ক মুখের পানে চাহিতে পারিবে না। লালসা-কোলাহলে বধির কর্ণ তার মুখের সত্য কথা-গুলাত তার হৃদয়ের কাছে উপস্থিত করিবে না; হলফ করিয়াও যদি সে বাবুকে, রাত্তে যা যা ঘটিয়াছে, শুনাইয়া দেয়, এ মর্ম্মাহত ধনী শক্তিমানত তার একটা কথাও বিশ্বাস করিবে না!

ব্রজেন্দ্রের ক্রোধের মাত্রাটা অনুমান করিতে গিয়া রাখু শিহরিয়া উঠিল।

তার বেশ বোধ হইল, এখন অদৃষ্টে যাই থাকুক্, চারুর ঘরে এই বাবুর চোখে না ফেলিয়া, ভগবান তাহাকে বেশ্যা-গৃহে অপঘাত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভ্রমটাও সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল, কি একটা অশুভক্ষণে স্মৃতির মোহে চারুকে রাণীর মত দেখিয়া আত্মহারা সে এমন একটা কাজ করিয়াছে যে, এতদিনের দুঃখে দারিদ্র্যের ভিতরেও যে মূল্যবান বস্তুটি কাল পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারে নাই, আজ তাহা সেই তার চির-নির্ম্মল চরিত্র-খ্যাতি সহসা কর্দ্দমাক্ত হইয়া কলিকাতার পথে যে সে লোকের পদদলনে মথিত হইতে চলিয়াছে! তার নিষ্কলঙ্কতা বুঝাইবার কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া সে চক্ষু মুদিল।

মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল, দীপালোকের শত সূক্ষ্ম রশ্মির তারে গাঁথা সেই অপূর্ব্ব গানের আধার চারুর হাসি-অশ্রুর প্রয়াগ-সঙ্গম মুখশ্রী। একটি পলক-ব্যাপী রূপের ইঙ্গিতে যেন আকাশ হইতে মর্ম্ম-বেদনা মাখিয়া সে তাহাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—ওগো, আমাকে ভেঙে দিয়োনা।

সে স্থির করিল, ভাগ্যে যাই থাকুক, কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একবার সে দেখা করিবে।

কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা হইতেই রাখুর যথেষ্টই তিরস্কার ভাগ্যে ঘটিল। ঘটিল তার অনেক সম-কর্ম্মীর সম্মুখে। তাহারাও বৃদ্ধের তিরস্কারের সঙ্গে দুই একটা টিট্‌কারীর কথা যোগ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। যে ভয়ে রাখু চারুর দত্ত পট্টবস্ত্র পরিয়া তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই, তাহাও সে এড়াইতে পারিল না—বাড়ীওয়ালার ঘরের মেয়েরা গৃহিনী হইতে ছোট ছোট মেয়ে বউ পর্য্যন্ত রাখুর রাত্রি-বিলাস কথা শুনিতে অন্দরের দুয়ারে আসিয়া কবাটের ফাঁকে ফাঁকে চোখ দিয়া দাঁড়াইল।

সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, রাখু আপনার যা কিছু সব লইয়া ক্রুদ্ধ কর্ত্তার নির্দ্দেশ মত বাসা পরিত্যাগ করিল।

(৩৬)

ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রাখু যখন বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন যেদিক দিয়া প্রতিদিন ঠাকুর পূজা করিতে যাইত, সেই পথ ধরিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে মেয়েদের মধ্যে কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হইল।

যে সময় নির্ম্মলা ও শুভার মা'র মধ্যে তার সম্বন্ধেই কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তখন ত্রিতলে উঠিতে রাখুর মাত্র পাঁচ ছয়টা সিঁড়ি বাকি। দৈব-নির্ব্বন্ধে সে সেই কথাগুলা শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্র তার মনে হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তার সহসা কম্পিত পদদ্বয় আর তাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করিল না। ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সাহসও সে হারাইল।

অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিতে যেমন সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে পা দিয়াছে অমনি সে দেখিতে পাইল,আধমুক্ত বক্ষ দুই হাতে ঢাকিয়া শুভা তাহাকে দেখিয়া পলাইতেছে। শুভা কলতলা হইতে স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছিল। রাখু বুঝিল চোরের মত চলিয়া আসা কাজটা তার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। নহিলে তার পদশব্দে বালিকা নিজকে সাবধান করিতে পারিত।

এখন আর সে ভুল সংশোধনের উপায় নাই বুঝিয়া পলায়নপর বালিকাকে সে সম্বোধন করিয়া বলিল —"দিদি! তোমার বৌদি এই কাপড় ছাতি আমাকে আজ ব্যবহার করিতে দিয়েছিলেন, এইখানে রেখে যাচ্ছি, তুমি তাঁকে দিয়ো।"

ইহার মধ্যে শুভা কাপড় ঠিক করিয়া লইয়াছে। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"আপনি আজ পূজা করিবেন না?"

"না।"

"কেন?"

"সেটা তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর!"

"বৌদি যে আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ ক'রেছেন!"

"আমি থাকতে পারব না। আজই আমাকে দেশে ফিরতে হবে। খেতে গেলে গাড়ী পাব না। তোমার বৌদিকে ব'ল।"

উত্তরের আর অপেক্ষা না করিয়া রাখু একবারে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল।

যদি সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টির একটা বড়রকমের ঝোঁক না আসিত আর বুঝি নির্ম্মলার সঙ্গে তার দেখা হইত না। বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেকের জন্য বৃষ্টির বেগ হ্রাসের অপেক্ষা করিল। তাহার নিজের একটা ছাতি ছিল, কিন্তু তাহা এমন জীর্ণ ও এতস্থানে ছিন্ন, সেই ধারাবর্ষণে সেটা তাহার বিশেষ কিছু উপকারে আসিত না। যদিও ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে আর একমুহূর্ত্তও থাকিতে তার ইচ্ছা ছিল না, মানুষের মজ্জাগত আত্মরক্ষার অভিলাষ আরও কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে সদর দরজায় ধরিয়া রাখিল।

যতই রাখু ধীর হউক, শুভার মা'র মুখের কথা শুনিয়া, এক মুহূর্ত্তেই সে বাড়ীর সকলের উপরেই তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। সে সেই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল, যদি ইহার পর কখনও কোনও কালে ইহারা তার নির্দ্দোষিতা বুঝিয়া অনুতপ্ত হয়, তথাপি আর সে এ বাড়ীতে পূজারির কাজ করিবে না। ইহাদের শত অনুরোধে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে রাখুর কেমন একটা তন্ময়তা আসিল। তাহার পল্লীগত আজীবনের দারিদ্র্য কতকগুলা অভিমান সেই তন্ময়তায় প্রবিষ্ট করাইয়া তার দেহটাকে পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিয়া দিল। সহসা তার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত একদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অমনি পশ্চাতে এক মৃদু আর্ত্তনাদ। তার বজ্রমুষ্টি এক অতি কোমল দেহে আঘাত করিয়াছে।

অতি বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া যাহা সে দেখিল, তাহাতে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল। শুভা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইতে অশক্ত, একবারে বসিয়া পড়িয়াছে। রাখু দেখিল তার অঙ্গুলি ভেদিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

"আমি একি সর্ব্বনাশ করলুম!"

"কিছুই করেন নি।" বলিয়া নির্ম্মলা অন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সত্বর শুভাকে উঠাইয়া তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিল।

রাখু প্রাণহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নির্ম্মলা বসনাঞ্চলে শুভার মুখ মুছাইতে মুছাইতে রাখুর চোখে সমবেদনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল—"আপনি কিছু মনে করবেন না। যা কিছু ঘটেছে সব আমার দোষে। আমি অভাগী যদি আপনাকে দূর হইতে ডাকিতাম! আপনি আজ যেতে পাবেন না। আমি কোনও মতে আপনাকে যেতে দিব না।"

ঠিক এমনি সময়ে, কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া বারান্দার দিক হইতে নালু বাবু ছুটিয়া আসিল। সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে নির্ম্মলা তাহাকে বলিল—"ভট্টাচাজ্জি মশাইকে তোর পড়বার ঘরে নিয়ে যা।" খবরদার ওঁকে যেন চলে যেতে দিস্‌নি।" বলিয়াই নির্ম্মলা শুভাকে লইয়া চলিয়া গেল। অন্দরের দোর দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল নালু বাবু এক হাতে বুচকি, অন্য হাতে রাখুর হাত ধরিয়া তাহাকে বারান্দায় তুলিতেছে।

(৩৭)

চারুর চিঠিখানা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই ব্রজেন্দ্রের সদ্‌বুদ্ধি জাগিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গাস্নানের নামে ঘর হইতে বাহির হইয়া তখনও পর্য্যন্ত ফিরে না আসার সংবাদ তাহাকে কতকটা হতবুদ্ধি করিয়া দিল। বিশুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়াও, চারুর গঙ্গাস্নানে যাওয়া কথাটাই ধারণা করিতে তার মনের ভিতরে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী সংশয় সহসা প্রবিষ্ট হইয়া তার বুদ্ধিকে এমন জটিল করিয়া তুলিল যে, প্রথমে সে সংবাদটাকে কোনও মতে সত্যের পার্শ্বে বসাইতে পারিল না। অথচ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করাইতেও তাহারা তাহাকে কোনও একটা নির্দ্দেশের ইঙ্গিত করিল না।

দুই একটা বড় পার্ব্বণ ছাড়া, যতদিন চারু তাহার কাছে ছিল, একদিনের জন্যও তাহাকে সে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখে নাই। যে দুই একদিন সে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, ব্রজেন্দ্রের অনুমতি লইয়াই গিয়াছিল। এবং গিয়াছিল ব্রজেন্দ্রেরই গাড়ী করিয়া। দুরস্থ নদীতীরে কোনও দিন তার জ্ঞানতঃ চারু পদব্রজে যায় নাই। গঙ্গাস্নানে যাইতে কখনো যে চারুর আগ্রহ ছিল, তাহাও ত একদিনের জন্য ব্রজেন্দ্র বুঝিতে পারে নাই! চারুর স্নানে বিলাস ছিল, খরচ ছিল।

সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া ঠিক ঐরকম দিনে তার গঙ্গায় যাওয়া এবং ফিরে না আসা—এই দুইটী অদ্ভুত ব্যাপার রহস্যের আকারে তার বুদ্ধিটাকে যে সংশয়-কলুষিত করিবে ইহাতে বিচিত্রতা কিছু ছিল না। তথাপি সদ্‌বুদ্ধি তখনও পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া শত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল।

মনে মনে এটাত সে স্থির করিয়াইছিল, চারুর চিঠি, বামুনের সঙ্গে রাত্রিবাস, হেমার মুখ হইতে শুনা সমস্ত ঘটনা, চারুর স্নানে যাওয়াও ফিরে না আসা—এ সকলের সঙ্গে যত কিছু রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, এখন হইতে চরিত্রে আর কখন সে অসংযত হইবে না। আর যদি সত্যসত্যই চারু গঙ্গায় ডুবিয়া থাকে এবং সে নিশ্চিত বুঝিতে পারে ওই পূজারি বামুনই তার হতভাগ্য স্বামী, তাহা হইলে চারুর সম্পত্তিতে তাহাকে অধিকারী করিতে তার সমস্ত এটর্ণী বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে সে কুণ্ঠিত হইবে না। অন্ততঃ যতটা পারে ব্রাহ্মণকে পাওয়াইয়া চিরদিনের জন্য মনকে সে অনুশোচনা হইতে নিষ্কৃতি দিবে।

চারুর চিন্তায় ব্যাকুল হইতে গিয়া ব্রজেন্দ্র শেষে তার বিষয় অধিকারের চিন্তাকেই একটু গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বসিল। প্রথমতঃ সে স্থির করিল,

চারুর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ বাহির হইতে না হইতেই যখন তার সম্পত্তি লইয়া একটা গণ্ডগোল বাধিবেই, কোম্পানীর কাগজ কয়খানা সে আর হাতছাড়া করিবে না। দ্বিতীয়তঃ নূতন বাড়ীখানার দলিল এখনও পর্য্যন্ত যখন তাহার আফিস হইতে আনা হয় নাই, তখন সেটাকে সম্পূর্ণভাবেই আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি। তখনকারমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিবার যতপ্রকার উপায় হইতে পারে স্থির করিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কিন্তু চারুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যেমন সে চারু ও রাখুর পূর্ব্বরাত্রির মিলন-নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিল, অমনি তার ঈর্ষাকুণ্ঠিত দৃষ্টি তার মনে একটা বিষম ক্রোধের ভাব প্রবেশ করাইয়া সমস্ত তার সদ্‌বুদ্ধিকে কুঙ্কিগত করিবার জন্য অগণ্য বাহুদিয়া যেন আঁকড়িয়া ধরিল। যদি একটু শিক্ষার কোমলতা, এবং মর্য্যাদার অভিমান সান্ত্বনার আভাসে তার ক্ষুব্ধচিত্তকে অনেকটা শান্ত না করিত, তাহা হইলে নিশাশেষে হেমার মুখ হইতে ঘটনা শুনিয়া রিভলভার লইয়া সে যে অভিনয় করিতে বসিয়াছিল, রাখুকে নিকটে পাইলে অথবা চারুকে উপস্থিত দেখিলে সেই প্রকারের একটা অভিনয় না দেখাইয়া সে ক্ষান্ত হইতে পারিত না।

দেখামাত্র সে প্রথমটা প্রকৃতি হারার মত হইল। সোফার উপর সাজানো বাঁয়া, তবলা, হারমোনিয়ম উভয়ে উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া রাখু ও চারু যেরূপ মুখামুখী বসিয়াছিল, সেইরূপভাবেই পড়িয়াছিল। সোফার নীচে খোল, দাঁড়া আরসীর তলায় অযত্নরক্ষিত বুরুষ চিরুণী, ঘরের প্রায় একরূপ মধ্যেই রাখুর ভুক্তাবশেষ বুকে লইয়া শ্বেতপাথরের থালাবাটি। এই সকল দেখিয়া এবং তাহাদের সাহায্যে চারুর ও রাখুর অবস্থান কল্পিত করিতে গিয়া সে পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষের মত দেখিয়া ফেলিল।

সে যেন দেখিল গায়িকা চারুর বিলোল দৃষ্টি এই নবাগত বাদকের চতুর কটাক্ষের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছে। তার বাজানোর বোলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে, চারুর সেই অপার্থিব সুরতরঙ্গ অবলম্বন করিয়া, লালসার পর লালসা তার মুখে, চোখে, অধরে, নিশ্বাসে পাগলের মত জড়াইয়া ঘরের বাতাসকে এমন কি সমস্ত বস্তুগুলাকে পর্য্যন্ত পাগল করিয়াছে। সকলেই যখন পাগল হইয়াছিল, তখন ওই ভিখারী বামুন—ওই চাঁদ হাতে করা বামন—ওই কি একাই কেবল স্থির ছিল?

প্রশ্নটা মনে উঠিতেই ব্রজেন্দ্র নিজেই তার যথাযোগ্য উত্তর আপনাকে শুনাইয়া বাস্তবিকই কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধে প্রকৃতি হারার মত হইয়া উঠিল। পূর্ণ তিন বৎসর ধরিয়া সে যে চারুর একরূপ পূজা করিয়াছে। অর্থের পর অর্থ তার পায়ে ঢালিয়া অলঙ্কারের পর অলঙ্কারে তার অঙ্গ সাজাইয়া তাহার শান্ত সুশীলা স্ত্রী আজিও পর্য্যন্ত যে আদর তার কাছে পায় নাই, তার শতগুণ আদর আপ্যায়ন ইষ্টদেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলির মত চারুর শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে সে উপঢৌকন দিয়াছে। এততেও সে সর্ব্বনাশী বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ইতস্ততঃ করিল না!

সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা মনে করিতে সাহস না হইলেও চারুর চিঠির অনেক কথাতেই ব্রজেন্দ্রের বিষম সন্দেহ হইল। তার গঙ্গায় ডুবিয়া মরাটা সে কিছুতেই মনে আনিতে পারিল না। রাত্রির ক্রিয়া কলাপ সমস্তই বিদিত হইয়াছে জানিয়া বিশ্বাসঘাতিনী বাড়ীর আশে পাশে কোনও স্থানে গা ঢাকা দিয়া আছে। কোথায় আছে, ঝি চাকর দুজনেই, অন্ততঃ ঝি নিশ্চয়ই জানে।

তথ্য বাহির করিবার নানারূপ চেষ্টা যখন ব্রজেন্দ্রের ব্যর্থ হইল তখন সে উভয়কে যত পারিল তিরস্কার করিল এবং যখন তাহাদের নির্দ্দোষিতার হাজার রকমের কৈফিয়তে তার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম করিল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল চারুকে যে কোনও উপায়ে জব্দ করিতে হইবে। নহিলে কি হঠাৎ একটা দৃষ্টির নেশায় পড়িয়া পাপিষ্ঠা ব্রজেন্দ্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি ওই বামুন-নামধারী একটা বর্ব্বরের সেবায় উড়াইয়া দিবে।

ব্রজেন্দ্রের যখন ঠিক এইরূপ মনের অবস্থা, তখন হেমা তার তত্ত্ব লইতে নির্ম্মলা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সেও গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চারুর রাত্রিকালের বিলাসচিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সুতরাং আগে হইতেই মোহগ্রস্ত প্রভুকে কথায় উত্তেজিত করিতে তার বিলম্ব হইল না। সেই উত্তেজনার মুখে ব্রজেন্দ্র তাহাকে বলিয়া দিল, বামুন যাতে তার বাড়ীর ঠাকুর আর স্পর্শ না করে তার ব্যবস্থা করিতে।

চারু মরিয়াছে এবং বাঁচিয়াছে এই দুইটা অনুমানের ভিতরে ব্রজেন্দ্র যত পারিল চিন্তার একটা অভঙ্গ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। যখন তার মনে হইল চারু বাঁচিয়া আছে, তখন সে ঘরের ফরাসের উপর চিন্তাচঞ্চল মস্তক লইয়া বহুবার পাদচারণ করিল। যখন সে বুঝিল মরিয়াছে, তখন তার চিন্তানত

মাথা চারুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যেগুলা অতি সহজে হস্তান্তরিত করিতে পারা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

চারু মরিয়াছে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া এবং সে জন্য যথা কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কলাশিল্পে সত্য

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

শিল্প সম্বন্ধে পুরাতন ও নূতন ভাবুকদের জন্য এক চিরন্তন বিবাদ রহিয়া গিয়াছে। পুরাতনপন্থীরা স্বভাবতঃই বয়োধর্ম্মবশতঃ সংরক্ষণশীল, আর নূতন ভাবুকের দল চিন্তারাজ্যের সব বাড়ীগুলাই ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়। কলাশিল্পে—অর্থাৎ কাজে, চিত্ররচনায় ও ভাস্কর্য্যে এই বিষয়টা গভীরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের জোয়ার যেমন বাঁধ বাঁধিয়া সীমাবদ্ধ করা যায় না, তেমনি নূতনের দল কোন বাধাই মানিতে চায় না। ফরাসী নাট্যকার ব্রিয় (brieux) একখানা নাটক লিখিলেন—"Damaged goods" নাটকের বস্তু—উপদংশ—ঘটিত ব্যাধি সমাজশৃঙ্খলার অভাববশতঃ কেমন করিয়া পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ওস্কার ওয়াইল্ডের 'Salome' ইবসেনের Ghosts, বিয়রন্সনের Marit ইত্যাদি আজকালের সৌখীন সমাজ পাঠ্য বইগুলি নবীনগণের মধ্যে আদর লাভ করিলেও বয়োবৃদ্ধগণের নিকট ইহারা দুষ্পাচ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইয়োরোপের যে দেশের কথাই ধরি না কেন, খ্রীষ্টান সভ্যতা যে খ্রীষ্ট প্রদর্শিত পথে চলিতে পারে নাই, তাহা ইয়োরোপীয় সাহিত্যালোচনায় বেশ বোঝা যায়। তাই বোধ হয় দার্শনিক অধ্যাপক Seeley তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত Ecce Homo নামক পুস্তকে খ্রীষ্টের অতিমানুষ ও মানুষ মূর্ত্তির সমন্বয় ব্যাখ্যা করিতে নামিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের দল নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিবেন—'সাহিত্যকে ধাপার মাঠ করিলে তাহাতে জোর ফসল ফলাইতে পারিবে সত্য, কিন্তু ও ভূমি যে দেবোত্তর করা

চলিবে না! ও কলুষ ভূমিতে দেবতার দেউল কেমন করিয়া নির্ম্মাণ করিবে?' তাঁহাদের মতে সাহিত্যে 'সুরুচি' বলিয়া একটা মস্ত বড় জিনিষ আছে। অবশ্য, এটা এই দেশের মত। যে পাশ্চাত্য দেশ আমাদের ভাষা ভাব, ধ্যান ধারণা, আশাআকাঙ্ক্ষা এমন অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, সেই দেশের Laus Veneris বা মকরকেতনের স্তবোক্তি আমাদের মস্তিষ্কে যাহাতে কোনও রূপে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য তাঁহারা আমাদের সবকটা ইন্দ্রিয়ের দ্বার একবারে বন্ধ করিয়া দিতে বলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, উদ্দেশ্য লইয়া কখনো কোনও শিল্প রচনা হইতে পারে না,— হইলেও সে শিল্প সর্ব্বজন গ্রাহ্য বা Classic হইতে পারে না। শিল্পীর মন আকাশের বায়ুর মত স্বৈরগতি, ঝরণার জলের মত অবিরাম ও উদ্দাম। নদী কবে পাহাড়ের নিভৃত নির্জ্জন আঁধার কন্দর হইতে বন্ধুর কঠোর কূলভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে নিজেই জানেনা, কিন্তু তবুও তার ছোটার বা বহিয়া যাইবার বিপুল আবেগ একটুও কমে নাই। শিল্পীর মন যখন কোনও একটা বিশেষ কল্পনাসৃষ্টির মোহে আবেশময় হইয়া পড়ে, তখন সে বুঝিতেই পারে না যে কোথায় তাহার শেষ! সব সৃষ্টির মূলে এই আঁধার, এই গোপনতা, এই আনন্দ বিভোর আত্মবিস্মৃতির ভাব। ধ্যানপ্রশান্ত শিব যেমন আপনার ধ্যান লোকেই আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সিসৃক্ষু শিল্পী তেমনি সৃষ্টির মোহে আপনার মধ্যেই আপনি আত্মসংবৃত হইয়া যান। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া শিল্পী আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৌশল দেখাইতে পারেন নাই, যদিও বা দেখাইতে চেষ্টা করেন,সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া যায়।

সুতরাং শিল্পীর রচনার মূলই যখন উদ্দেশ্যহীন, তাহার বিরুদ্ধে কোনও সুরুচি বা কুরুচির উদ্দেশ্য আনা চলে না। অন্ততঃ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ব্যতিব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। পাখী গান গায়—কারণ গান তাহাকে গাহিতেই হইবে, সে গান শুনিয়া কেহ আনন্দ পা'ক আর না-ই পা'ক, তাহাতে তার কিছু আসে-যায় না। যুঁই ফুল ফুটিলেই সৌরভ ছুটিবে, কিন্তু ফুল সে সৌরভের উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া কখনো গন্ধের নির্য্যাস প্রকাশ করে না। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' আগাগোড়া পড়িয়া গণিতজ্ঞ নিউটন্ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'And what does it prove—কি বুঝাতে চায় বইখানা?' শিল্প যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় ও শিল্পীর প্রাণের কথাটী অভিব্যক্ত করে, তাহা হইলে সে শিল্পটী জনসমাজে চিরকালের আসন পায়। মানবের হৃদয়ের যেগুলি

মুখ্য বৃত্তি—দয়া, প্রেম, বাৎসল্য, প্রতিশোধেচ্ছা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি ইহারাই উচ্চদরের শিল্পীগণের কল্পনাকেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে। পুস্তকের যেখানটা আমাদের খুব ভাল লাগে, সেখানটা এইরূপ মনের একটী সহজ, অখণ্ড ও সরল ভাবই প্রকাশ করে। লেডী ম্যাকবেথের উন্মাদ অবস্থার কাহিনী, প্রতি-শোধপরায়ণ ওথেলোর ডেসডিমনাকে হত্যা, পাপভ্রষ্ট আডামের ঈভ্‌কে ক্ষমা, এব্‌সালোমের মৃত্যুতে করুণ খেদোক্তি—সাহিত্যে এইগুলি সহজেই আমাদের হৃদয়মন সমবেদনাতুর করিয়া তোলে। তাই শ্রেষ্ঠ রচনার রসসৃষ্টিভেদে আমাদের মানসিক ভাবটীও তদনুরূপ ভাব-প্রণোদিত হয়।

কলাশিল্পের যে মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে, তাহা সত্যেরই মূর্ত্তি। সত্যকে মিথ্যার আচরণ দিয়া শিল্পী কখনো প্রকাশ করেন না। তাই Rowley Poems এর রসমাধুর্য্য যে কৃত্রিম, তাহা রসগ্রাহীর নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। জনন-ক্রিয়াটা যে সকলের কাছে 'প্রকাশ্য গোপনতা (open secret of nature) তাহা জার্ম্মান কবি গয়টে একদিন বন্ধু একার্‌মান্‌ (Echermann) এর নিকট বলিয়াছিলেন। এই প্রকাশ্য গোপনতাটা আমরা যতই লুকাইয়া রাখি না কেন, সে কেবল আমাদের মনকে চোখ ঠারা! অতএব ইহাতে শিল্পীরও অধিকার আছে। শিল্পী বিশ্বের মহেশ্বর—সর্ব্বত্র তাহার অবারিত দ্বার। শিল্পীর এই স্বাধীনতাটুকু তিনি নিজ কল্পনাশক্তির বলেই পাইয়া থাকেন। ইহার জন্য কোনও সমালোচকের নিকট charter বা ছাড়-পত্র তাঁহাকে নিতে হয় না। শিল্পী সেক্‌স্‌পীয়রের ভাষায় 'unchartr'd libertine'. সমগ্র ইয়োরোপীয়ান সাহিত্য গ্রীশের গথিক্‌ ও আওনিক্‌ (Gothic and Ionic) ভাবে প্রবুদ্ধ। গথিক্‌ সাহিত্যের ধারা ঐরাবত-গতির মত, আর আইওনিক্‌ সাহিত্যের ধারা সর্প-বিসর্পী সূক্ষ্ম গতির মত। গ্রীশ সভ্যতা সুরুচি ও কুরুচির দোহাই দিয়া সাহিত্যের গণ্ডী কদাচ সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় নাই! আইওস্‌ ষ্টেফানস্‌, (বা কুসুম-মুকুটশোভী আইওনিয়া) সমগ্র জগৎটাই শিল্পীর ইম্পীরিয়ালিজ্‌মে আনিয়া দিয়াছিল। তাই সেখানে ফিডিয়াস, হোমর, ঈস্‌কাইলাস, সফোক্লিস ও প্লেটো। আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠি ত বড় বেশী লম্বা নয়, সুতরাং আমাদের জন্মগত সংস্কার লইয়া কোনও সাহিত্যের আলোচনা করিয়া যদি সেখানে আমাদের সংস্কার-বিরুদ্ধ কিছু দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের নাসিকা-কুঞ্চন না করাই ভাল।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বা কলাবিৎগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

এই কারণেই সমাজে অনাদৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী এই জন্তই একদল লোকের নিকট চির-নিন্দিত হইয়া আছে। বৈষ্ণব কবিগণের এমন অনেক রচনা আছে যাহাতে রূপকের কোনই অবসর থাকে না। সে গুলি যেন নিছক কাম-স্তুতি। ইহা সত্য হইলেও মানবজীবনে যে বৃত্তিটা নিয়ন্তারূপে গোপনে সৃষ্টির ধারা সনাতনকাল হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন্ সাহসে যুদ্ধ প্রচার করিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সত্যকে লুকাইয়া রাখা যায় না, রেডিয়ামের মত ইহা বাহির হইয়া পড়িবেই।

কিন্তু এই যুক্তিতেও প্রাচীনের দল নীরব হইবেন না। তাহারা বলিবেন, 'মানিলাম, বাপু, তোমার কাম-রচনার সার্থকতা। কিন্তু ওটার উপর অত ঝোঁক (emphasis) দাও কেন, বলত? কাজকর্ম্ম না পেলেই কি খুড়ার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা?'

সাহিত্যে যাঁহারা বিদ্রোহবাদী, তাঁহারা নিজের প্রতিভার গতি হিসাবে স্বকীয় পন্থা স্থির করিয়া লন। এইরূপে ভিক্টোরিয়া যুগের শেষ সময় সুইন্-বার্ণ-প্রমুখ 'কমলবিলাসী' কবিকুলের (Fleshly school of poets) উদ্ভব হইয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও ভাবের নগ্নতাই (Eterde sur la nude) যাঁহারা স্বীয় শিল্পের মুখ্য উপাদান করিয়া লইয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহারা হিন্দুবধূর লজ্জাবরণগুণ্ঠিতা মূর্ত্তি দেখাইবেন? এ যে অদ্ভুত দাবী!—পরন্তু আমাদের মনের ভাবের বাহ্য প্রচার হইলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল? প্রতিভার বিকাশ 'মৌনং হি শোভনং' উক্তি মানে না, এই যা দুঃখ! বিশাল বিশ্বসৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্রই একটা উদ্দাম প্রকাশের ইচ্ছা। যৌবন লইয়াই সৃষ্টি। বৃদ্ধের জীবনেও এই উষার অপূর্ব্ব তারুণ্য ফুটিয়া বাহির হয়। তাই আমেরিকান্ লেখক লাওয়েল্ গয়্টের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে জীবনের দুই দিকেই তিনি কিশোর (He was a child at both ends of his career')। সৃষ্টি এই চিরকিশোরকে লইয়াই আপন অভীষ্ট পথে অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিয়াছে। জীবনে যাহা সত্য বলিয়া পূজা করি, আদর করি, বুকে টানি,—শিল্পেও তাহার সমান পূজা, সমান আদর, সমান সম্মান। 'ভারতীয় শিল্পকলা পদ্ধতি' তাই এতদিন অনাদর ও উপেক্ষার আওতায় পড়িয়াআজ সমাজে একটু স্থান পাইয়াছে কিন্তু এখনও 'জলাচরণীয়' হইতে পারে নাই। চিরাচরিত প্রথাগুলি বীজ গণিতের নিয়মের মত—$(a \times b)^2 = a^2 \times 2ab + b^2$। শিল্প কিন্তু এই নিয়মের গণ্ডীতে ধরা পড়ে না। তাই শিল্পের সাধনা—কঠোর সত্যের সাধনা।

হৃদয় যখন অরুণ শতদলের মত বিকচ প্রফুল্ল হইয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই শিল্পের প্রকাশ হয়। এমন কথা বলিতেছিনা যে কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বা শিল্পমাত্রই আদরণীয় বা উচ্চভাবদ্যোতক। কিন্তু যে শিল্পে শিল্পীর যথার্থ মূর্ত্তিটী ধরা পড়িয়াছে, তাহা আর শিল্পীর নিজস্ব 'সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত থাকে না,—তাহা তখন সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বকালের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। আর যথার্থ শিল্প কয়টাই বা দেখিতে পাওয়া যায়? তাহা অবতারের আবির্ভাবের মতই কদাচিৎ পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের মত গরলপানেই শিল্পীর নিবিড় আনন্দ, সেই গরলপানের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে শিল্পী যুগে যুগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ানো না গেল॥'

অবসাদ

[শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক]

বলি বক্ষে কেন রে থেমে এলো ঘন স্পন্দন?
কেন কণ্ঠে রে তোর ক্ষীণ হয়ে এলো জয়বন্দনা গীতি আজ?
কেন অর্দ্ধেক পথে থমকি দাঁড়ালি,
উচ্ছ্বসি ওঠে হাহাস্বরে ভীরু ক্রন্দন ?
বলি কম্পিত বুকে অঙ্কিত, একি!
কিসের অলীক ভীতি লাজ?
এলো ক্ষীণতর হয়ে জয় বন্দনা গীতি আজ!
ওই তীর্থ যে তোর দেখা যায়,—নহে বেশীদূর!
তবু বন কণ্টকে ছিন্ন চরণ
পশ্চাতে কর দৃক্‌পাত্ ওরে শ্রমাতুর?
ছি-ছি! রক্তে কি তোর জ্বলে নাই তবে শাশ্বত হোমশিখা?
ললাটে কি তোর শোভে নাই তবে
সত্যের পূত সিতচন্দন-লিখা?
হায় পরাণে কি তোর বাজে নাই তবে মুক্তির বীণা রে?

ওহো তা'না হলে কেন আঘাতে কাঁদিয়া—
লুটিয়া পড়িছ ধূলায় ভূতলে বনবীথি মাঝ ?
এলো ক্ষীণতর হয়ে জয় বন্দন গীতি আজ !
কেন মন জোড়া তোর অবসাদ এত অবসাদ ?
কেন আলস আসিছে অঙ্গেতে হায়,—
মিটিয়া গিয়াছে আজি কিগো তবে তব সাধ ?
কেন অবসাদ—এত অবসাদ ?
বলি আগুণ জ্বালান কথার আড়ালে
আপন লুকায়ে উল্লাসে তুই ছুটিয়া চলিলি কদিন বেশ !
ভাবিলি মানসে এইবার তোর
দুয়ারে এলোরে সে মহাতীর্থ, —স্বাধীন দেশ !
একি ছেলে খেলা—মিছে ছেলে খেলা ?
একি বাক্য-বাতাসে বালির দেওয়াল ঠেলে ফেলা ?
ওরে চল্ চল্ জোরে চল্ চল্ !
আজি আত্মায় তোর উঠুক্ জ্বলিয়া সত্যের জ্যোতি জ্বল্ জ্বল্ !
আজি সুপ্তি মাখান মুক্তি ব্যথায় ঝরুক অশ্রু
নয়নে রে তোর ছল ছল !
তুই চল্ চল্ আজি চল্ চল্ !
আজি কর্ম্মের ঘায়ে ভেঙে ফেল্ —ফেল্
পাষাণ-কঠিন সব বাঁধ !
কেন অবসাদ —মিছে অবসাদ ?

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

পিঙ্গলের অতীত জীবনের প্রায় কোন কথাই আজ আমার আর তেমন সুস্পষ্ট মনে নাই। কেবল তিনি যে সাধু হইয়া সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছিলেন, পরে আমেরিকায় গিয়া মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার সময় তথাকার বিপ্লবদলের সংস্পর্শে আসেন, এই টুকুই এখন মনে আছে, কিন্তু কেমন করিয়া এবং কেন প্রথমে সাধু পরে ইঞ্জিনিয়ার ও তৎপরে বিপ্লবপন্থী হইলেন তাহা আর আমার কিছুই মনে নাই, পিঙ্গলেও এ বিষয়ে আরও কিছু বলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

এই অধ্যায় হইতে আমার বলিবার অনেক কথাই যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাই হয়ত কত কথা আর বলা হইবে না। এই ভুলে যাওয়া ও মনে থাকার সহিত আমার মনে হয় আমাদের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমাদের স্মৃতিপটে কত বড় জিনিষ ছোট হইয়া যায়, ও ছোট জিনিষ বড় হয়, আবার অনেক কথা কেমন আমরা ভুলিয়াই যাই তাহার অর্থ বোধ হয় এই যে যাহা আমাদের স্বভাবের অনুকূল যাহা আমাদের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় তাহা ঘটনাই হউক বা কোনও দার্শনিক মতই হউক, অথবা আর যাহাই হউক না কেন, তাহা যেন জ্ঞাতসারে আমাদের স্মৃতিপটে ছবির মত আপনিই অঙ্কিত হইয়া যায়; আর যাহা আমাদের স্বভাবের প্রতিকূল তাহা হয় ভুলিয়া যাই আর না হয়ত যেন কেবল খণ্ডন করিবার জন্যই তাহাকে গ্রহণ করি এবং এই খণ্ডন করিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি ও ঘটনা আমাদের সাহায্য করে সেগুলিও বয়স ও অভিজ্ঞতার সহিত অর্জ্জন করিতে থাকি।

আর একদিন আণ্ডামানে থাকিতে, বোধ হয় রামেন্দ্রবাবুর জিজ্ঞাসা অথবা বিচিত্র প্রসঙ্গ পড়িয়া ঠিক এইরূপই আরও নানারূপ চিন্তার ধারা মনের মধ্যে গভীরভাবে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং এগুলি আমি একটি নোট বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। উপেনদাকে প্রায়ই সেগুলি আমি দেখাই-

তাম,উপেনদা ভাল বলিলে মনে বড় আনন্দ হইত। কি করিয়া সেই নোট বইটি নষ্ট হয় আণ্ডামানের কাহিনীর সহিত তাহা বলিব।

পিঙ্গলের কাশী আসিবার দিনদুইএকের মধ্যেই তাঁহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিঙ্গলের বিশেষ অনুরোধ ছিল যেন আমরা পাঞ্জাবে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বোমা পাঠাই; সেই জন্য পিঙ্গলেকে বলা হইয়াছিল যে বোমা পাঠাইতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু এক একটি বোমা করিতে প্রায় টাকা ১৬ করিয়া খরচ, তাই টাকার সাহায্য না পাইলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বোমা পাঠান সম্ভব হইবে না। তাঁহাকে পৃথ্বী সিং ও কর্ত্তার সিংদিগের কথাও বলা হইয়াছিল। এই টাকার জন্যও পাঞ্জাবীদের যথাযথ খোঁজ লইবার জন্য পিঙ্গলে পাঞ্জাবে গেলেন। পিঙ্গলের নিকট তাঁহার কয়েক-জন সঙ্গীর ঠিকানা ছিল। প্রায় সপ্তাহকালের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। রাশুদারও পাঞ্জাবে যাইবার এখন আর কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু তাঁহার যাইবার পূর্ব্বে আমি আর একবার পিঙ্গলের সহিত পাঞ্জাবে গেলাম।

ডিসেম্বর মাসের সকালবেলায় কন্‌কনে শীতে সাধারণ হিন্দুস্থানির বেশে আমিও পিঙ্গলে অমৃতসর সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি পাঞ্জাবি ভাষা বলিতে পারিতাম না, কিন্তু পিঙ্গলে পারিতেন। আমরা একটি গুরুদ্বারায় আসিয়া নামিলাম। এইখানে পিঙ্গলে একজন পাঞ্জাবি নেতার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইহার নাম মূলাসিং।

মূলাসিং শ্যাংহাইতে পুলিশের কাজ করিতেন ও সেখানেও পুলিশ ধর্ম্মঘট কারীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এবারে পেনাঙ্গের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীদিগের সহিত ও পরিচয় হইল। এই সময় গ্রামের অনেক শিখদিগকে এখানে যাওয়া আসা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা অধিকাংশই চাষা মজুর শ্রেণীর লোক, কিন্তু তাঁরাও দেশের কাজের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, শিখসম্প্রদায়ের এমনই শিক্ষা দীক্ষা। ইঁহাদের কাহার ও কাহার ও শরীর দেখিতে যেন ঠিক দৈত্যের মত ছিল।

এইবারে আমি মূলাসিংকে কেন্দ্রের আবশ্যকতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি এবং ইহার পর হইতে মূলাসিংই কেন্দ্রের ভার লইয়া বসেন। কিন্তু মূলাসিং এইরূপে কেন্দ্রে না বসিলেই ভাল হইত।

পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশাগত কর্ম্মীরা কর্ম্মের অভাবে ও খাওয়া দাওয়ার

অসুবিধায় খুঁত খুঁত করিতেছিলেন এবং ইঁহাদের অনেকের মধ্যেই এক অসন্তোষের ভাব গুমরিয়া উঠিতেছিল। ইহার জন্ত মূলাসিংই প্রধানত দায়ী ছিলেন। এই সব কর্ম্মীরা অনন্তমনা হইয়া দেশের কাজ করিবার জন্ত দূর দূরান্তর হইতে বাড়ী ঘর ইত্যাদি সব ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহই অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন না বা তখনকার অবস্থায় করিবার উপায়ও ছিল না। এই অবস্থায় যদি পেটের জন্ত এ'বেলা ও'বেলা কর্ত্তাদের নিকট অর্থের তাগাদা করিতে হয় ত সত্যই তাহা সকলকারই বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। ইঁহারা সকলেই থাকিতেন গুরুদ্বারায়, খাইতেন সন্নিকটস্থ হোটেলে। আমাদের দেশে দেশের কাজ করিতে গিয়া অনেক সময়ই এইরূপ নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিই অনেকের মনে বেদনা দিয়াছে এবং তাহা হইতে অনেক সময় অনেক অনর্থও ঘটিয়াছে। তাই অনেক সময় মনে হয় আর্থিক হিসাবে স্বাধীন না হইতে পারিলে দেশের ও দশের কাজে নামা উচিত নহে; আবার ইহাও দেখিয়াছি, আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে যাইয়া অনেক সময়ই অর্থোপা-র্জ্জনই সার হইয়া পড়ে, এবং অনন্তমনা হইয়া দেশের কাজে না লাগিলে প্রায়ই কোন কাজ হয় না। আবার অন্তদিকে কর্ম্মের অভাবেও অনেক দল নষ্ট হইয়া গিয়াছে! এই সময় পাঞ্জাবে উপযুক্ত নেতার অভাবে অনেক কর্ম্মীই এইরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন; কর্ম্মহীনতায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, অথচ কর্ম্মীরা কর্ম্ম খুঁজিয়া পাইতেছেন না। রাসবিহারীই ঐরূপ নেতা ছিলেন যিনি উন্মত্ত জনসংঘকে কতক্ পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলেন। আমি আপাততঃ এই গোলমাল যতটুকু পারি শোধরাইবার চেষ্টা করিলাম। মূলাসিংএর নিকট শুনিলাম অনেক রেজিমেণ্টই বিপ্লবের সময় দেশবাসীর দিকেই যোগ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। যে সকল রেজিমেণ্টে তখনও লোক যায় নাই তাহার তালিকা করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশাগত কর্ম্মীদিগকে সেই সব রেজিমেণ্টে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

মূলাসিংহের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া পিঙ্গলে অন্যান্ত পরিচিত শিখদিগের খোঁজে "মুক্তসর"এর মেলায় চলিয়া যান। এই মুক্তসর মেলার পশ্চাতে এক অপূর্ব্ব ইতিহাসের কথা পাঠক বর্গকে না শোনাইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না :—

একবার "আনন্দপুর" দুর্গে গুরুগোবিন্দ সিং স্বীয় পরিবার পরিজন বর্গকে লইয়া প্রায় সাত মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন! এই অবরোধ ব্যাপারে উভয়

পক্ষই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। মুসলমান পক্ষ হইতে "আনন্দপুর" ত্যাগ করিবার জন্য গুরুর নিকট বারম্বার প্রস্তাব আসিলেও গুরু তাহাতে সম্মত হইলেন না। গুরু কোন মতেই সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া অনেক বহির্গমনেচ্ছু শিখেরা গুরুমাতা গুজরীকে স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন। গুরু গোবিন্দ সিং কিন্তু তবুও স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ক্ষুধার তাড়নায় ও অবরোধের নানা জ্বালায় কিন্তু অনেক শিখেরাই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পেটের জ্বালায় তখন তাঁহারা গুরুর আদেশও লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত। তখন গুরু গোবিন্দসিং বলিলেন—"তোমরা এতদিন শিখ গুরুর আশ্রয়ে ছিলে, এখন ক্ষুধার তাড়নায় গুরু বাক্য লঙ্ঘন করিয়া শঠদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছ, ইহাতে শিখ গুরুর দায়িত্ব কাটিয়া গেল; অতএব সকলে তদনুরূপ "বে-দাওয়া" লিখিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর।" কেবল ৪০ জন শিখ ব্যতিরেকে আর সকলেই ঐরূপ "বে-দাওয়া" লিখিয়া দিয়া গুরুকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে গুরু গোবিন্দ সিংকেও সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল এবং শত্রু তাড়িত হইয়া তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সেই ৪০ জন শিখ কিন্তু কোন অবস্থায়ই গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে গুরু গোবিন্দ সিং মদ্রদেশ আসিয়া পৌছিলে সেই "বেদাওয়া" শিখদিগের অনেকে আসিয়া গুরুদেবের সহিত দেখা করেন। তখন গোবিন্দ সিং বলেন—তোমাদের ইচ্ছা হয় "আমরা শিখ নহি এই কথা লিখিয়া দিয়া তোমরা চলিয়া যাইতে পার।" তখন পুনরায় ৪০ জন শিখ "আমরা শিখ নহি" এই কথা লিখিয়া দিয়া গুরু দেবকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এই বিপদের দিনে শ্রীগুরুকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কিছু পরেই তাঁহাদের মনে বিষম অনুতাপ উপস্থিত হয়। এদিকে "খেদরানা তালাও" নামক এক পুষ্করিণীর নিকট শত্রুপক্ষ পুনরায় গুরু গোবিন্দসিং এর দলকে আক্রমণ করিল। ঘোর সংগ্রাম করিতে করিতে গুরু গোবিন্দসিং দেখিলেন যে শত্রু পক্ষকে আর এক দল কোথা হইতে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে; গোবিন্দসিং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না উহারা কারা। মুসলমানেরাও এই নবাগতদের উন্মাদনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর প্রায় সকলেই ধরাশায়ী হইলেন। এইরূপ এক মুসলমানের বল্লমে ধরাশায়ী মৃতদেহ তুলিয়া দেখা গেল মৃতদেহ নারীর। ইঁহার নাম মায়ী ভাগো, ইঁহারই পরামর্শে ও প্রেরণায় "বেদাওয়া"

শিখগণ স্বীয় দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্তের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানের পর গুরু গোবিন্দসিং রণস্থলের প্রতি মৃত শিখের নিকট গিয়া রণক্লান্ত মুখ মুছাইয়া পিতার ন্যায় আদর যত্ন করিতেছিলেন। অবশেষে একজনের দেখিলেন তখনও প্রাণ আছে। ইঁহার নাম মহাসিং। মহাসিংএর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে নানা প্রকারে আদর যত্ন করিতে করিতে গুরু গোবিন্দ জিজ্ঞসা করিলেন "মহাসিং তুমি কি চাও!" মহাসিংএর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। মহাসিং বলিলেন "আমাদের লেখা আমরা শিখ নহি' পত্রটি নষ্ট করিয়া ফেলুন। এতক্ষণে গুরুজি বুঝিলেন এ দিকে কাহারা যুদ্ধ করিতেছিল। দেখিলেন সেই ৪০ জনাই এখানে প্রাণ বলি দিয়াছেন। মৃতদেহ মধ্যে নারী দেহও দেখিতে পাইলেন। গুরু গোবিন্দ সিং সেই "শিখ নহি" পত্রটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মহাসিং ও মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলেন। তখন গুরুগোবিন্দ সিং উপস্থিত সকল শিখকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যে 'খালসা' মধ্যে এমন মহাপ্রাণ আছে সে 'খালসা" সহজে নষ্ট হইবে না। একটিও ভক্তপ্রাণ যে স্থানে আত্মাহুতি দেয় সেস্থান পবিত্র হইয়া যায়। যেখানে এতগুলি মহাপ্রাণ প্রাণ বলি দিয়াছেন—অতঃপর সেই স্থানের নাম "মুক্তসর" হইল এবং এস্থানের জলাশয়ে যে স্নান করিবে সেই মুক্ত হইবে।" এইরূপে 'মুক্তসর' মেলার পত্তন হয়। ইহা শিখদিগের মহা মেলা; এখানে প্রতিবৎসর প্রায় লক্ষাধিক শিখ এক হইয়া থাকেন। শিখদিগের প্রতি উৎসবের সহিতই এইরূপ এক একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস কথা জড়িত আছে এবং প্রত্যেক শিখই এইরূপ উৎসবউল্লাসের মধ্যেই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছেন। আমার বিশ্বাস শিখেরা ভারতের এক অপূর্ব্ব জাতি।

পিঙ্গলে যখন "মুক্তসর"এর মেলা হইতে ফিরিলেন তখন কর্ত্তার সিং, অমর সিং ইত্যাদি সকলেই গুরুদ্বারায় উপস্থিত হইয়াছিল। কর্ত্তার সিং আমায় দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "রাসবিহারী কবে আসিবেন?" আমি বলিলাম, "এই এইবার তিনি আসিবেন, এখানে থাকিবার একটা সুবন্দোবস্ত করা হউক, আপনাদেরও কার্য্যের একটু শৃঙ্খলা হউক তবেত আসিবেন।" এই সময় আমি কর্ত্তারসিংকে কেন্দ্রের আবশ্যকতা বিশেষ করিয়া বোঝাই এবং বলি যে মুলাসিং এই কেন্দ্রের ভার লইয়া বসিয়াছেন। রাশবিহারীর জন্য অমৃতসর সহরে দুইটি ও লাহোরে দুইটি বাড়ী লইতে বলি। এ সব বিষয়ে দাদা পূর্ব্ব হইতেই আমায় সব বলিয়াছিলেন;

জেন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়ি নিজেদের হাতে রাখা হয়। এইরূপই ব্যবস্থা হইল; আমি অমৃতসরের বাড়ি স্বয়ং দেখিয়া পছন্দ করিলাম। লাহোরের বাড়ির জন্ত আর একজন গেলেন। কর্ত্তারসিং এর নিকট পাঞ্জাবের তদানীন্তন অবস্থার কথা শুনিয়া বড় আশান্বিত হইলাম, ভাবিলাম এইবার একটু কাজের মত কাজ হইতেছে। এই সময় আর একদল আমেরিকা প্রত্যাগত শিখ অমৃতসর এ আসেন। ইহাঁদের একজন নেতাকে আমি দেখি, একজনত এত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে গালের মাংসগুলি ঝুলিবার উপক্রম করিয়াছিল। যত দুর স্মরণ হয় বোধ হয় ইনিই সেই বৃদ্ধ, যিনি আন্দামানেও অদ্ভুত তেজের সহিত নিজের দিনকয়টি কাটাইয়া ৬০। অথবা ৭০ বৎসর বয়সে আন্দামানেই জীবন বিসর্জ্জন দেন। এত বৃদ্ধ বয়সেও ইনি আন্দামানের ধর্ম্মঘটকারীদিগের সহিত একত্র ধর্ম্মঘট করিতে ও কখন পশ্চাদপদ হন নাই। এই দলের কেহ তখন ও পর্য্যন্ত বাড়িতে যান নাই। ইনি পূর্ব্বেই স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ হইতে আমাদের ৫০০্ টাকা দিয়াছিলেন।

এই সময় কর্ত্তারসিং অদ্ভুত পরিশ্রম করিতেছিলেন, প্রত্যহ প্রায় ৪০।৫০ মাইল বাইকৃএ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে ছিলেন; এত পরিশ্রম করিয়া ও কিন্তু ইঁহার ক্লান্তি ছিল না, যতই পরিশ্রম করিতেছিলেন, ততই যেন ইঁহার স্ফূর্ত্তি বাড়িতেছিল। এই ঘুরিয়া আসিয়া আবার যে সকল বড় বড় রেজিমেণ্টে যাওয়া বাকি ছিল সে সব রেজিমেণ্টে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে কিন্তু নিজেদের কাজ করিবার দোষেই ইঁহাদের অনেকের নামেই ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তার সিংকে ধরিবার জন্ত এই সময় একবার পুলিশে এক গ্রাম ঘেরাও করে, কর্ত্তারসিং; গ্রামের সন্নিকটেই কোথায় ছিলেন, পুলিশের কথা শুনিয়া বাইকএ করিয়া সেই গ্রামেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিশ অবশ্য তাঁহাকে চিনিত না। সেবার কর্ত্তারসিং এইরূপ অসম সাহসিকতার গুণেই নিষ্কৃতি পাইলেন, তা না হইলে পথে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

এই সময় টাকার খরচ এত বাড়িয়া যায় যে দানের টাকায় আর কাজ চলিতেছিল না, তাই ইহারা কিছু কিছু ডাকাতি করিতে বাধ্য হন। পরে জানা গিয়াছে মূলাসিং লোক ভাল ছিলেন না; ইনি নাকি আবার দলের টাকাও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। যখন এ সব জানা যায় তখন আর প্রতি-কারের উপায় ছিল না। কারণ যত দুর স্মরণ আছে ইহার অল্প পরেই মাস্তাল

অবস্থায় ইনি ধরা পড়েন। ইনিই নাকি আবার ব্যক্তিগত শক্রতার বশবর্ত্তী হইয়া একজনার বাড়ীতে ডাকাতি করান।

বড় বড় আন্দোলন মাত্রেই দেখা গিয়াছে যে সাধু ও মহৎ চরিত্রের সহিত এইরূপ নরপিশাচ ও দলে আসিয়া জোটে; এ সব আন্দোলনের দোষ নহে, এ আমাদের মনুষ্য চরিত্রের দোষ। লেনিনও নাকি বলিয়াছেন প্রতি খাঁটি বলসেভিকের সহিত অন্তত ৩৯ জন বদমাইস ও ৬০ জন আহাম্মক তাঁহাদের দলে আসিয়া জুটিয়াছিল। (Russia's Ruin P 249 by H E Wilcox)

এবার পাঞ্জাবে প্রায় সপ্তাহ খানেক ইঁহাদের সহিত থাকিয়া ইঁহাদের অনেক আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। যদিও ইঁহারা অত দারুণ শীতেও অতি প্রত্যূষে স্নানাদি সারিয়া গুরুগ্রন্থ সাহেব ইত্যাদি পাঠ করিতেন কিন্তু হোটেলে খাইতেন বলিয়া খাওয়া দাওয়া অত্যন্ত নোংরা ধরনের ছিল। ইঁহাদের পরস্পরের ব্যবহার কিন্তু বড় সুন্দর ছিল; সম্বোধন করিবার সময়ে "সন্তো," "সজ্জনো," "বাদশাও" ইত্যাদি প্রকারের সম্মান সূচক শব্দ ছাড়া অন্য কোনরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেন না। ভাই নিধান সিংএর সহিত এইবার আসিয়া দেখা হয়। ইনিই সেই ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ। ইনি প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর দেশ ছাড়া ছিলেন ও চায়নায় থাকিতে এক চীনা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইঁহাকে প্রায়ই ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিতাম। একবার ষ্টেসনে গিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়াও ক্ষুদ্র একটি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া আপন মনে পাঠ করিতেছেন। ইনি যে কেবল লোক দেখানর জন্যই ঐরূপ করিতেন তাহা নহে। কারণ আন্দামানেও ইঁহাকে ঠিক এইরূপই দেখিয়াছি। ইঁহার যেরূপ তেজ ছিল অনেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সেরূপ তেজ দেখি নাই।

সাধারণতঃ পাঞ্জাবীদিগের নৈতিক চরিত্র বিশেষ মন্দ এবং পাঞ্জাবিদের মধ্যে আবার শিখদিগের চরিত্র অতি জঘন্য। বোধহয় এইরূপ হইবার প্রধান কারণ পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এখানে অসঙ্গত রূপে কম এছাড়া বোধহয় পাঞ্জাব তমোমুখী রাজসিক ভাবে পূর্ণ। চিরকাল বৈদেশিক-দের সহিত সংঘর্ষের ফলে ক্রমাগত নিম্নতর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এখান-কার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা যেন ক্রমেই ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য অব-নতির দিনে এইরূপ বিদেশীর সংস্পর্শ যেমন হানিকারক, উন্নতির দিনেও আবার তেমনই এই স্থানেই শ্রেষ্ঠ সভ্যতার বিকাশ সম্ভবপর। যাহারা মন্দের পথে সহজে যায়, ভাল হইবার ক্ষমতাও আবার তাহাদের মধ্যে যেমন

আছে অন্তের মধ্যে সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ; তাই অসংযম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা ও হিংসা বৃত্তিতে শিখ চরিত্র যেরূপ কলঙ্কিত, সেইরূপই আবার সংযম, ঔদার্য্য ও ক্ষমা বৃত্তিতে তাহাদের তুলনা মেলা কঠিন। তাই এই সে দিনও এই অধঃপতিত শিখদিগের মধ্য হইতে "নানকানা সাহেব"এ অমন অদ্ভুত বীরত্ব ও সংযমের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর নামেই কলঙ্ক অধিক কিন্তু এই পাঞ্জাবেই আবার সেদিনও সতীত্বের এমন গৌরবোজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হইয়াছিল যে এ কলিযুগে তাহার তুলনা নাই। লাহোর ডি, এ, ভি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দের খুল্লতাত ভ্রাতা, ভাই বালমুকুন্দ দিল্লিষড় যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়েন। এই বালমুকুন্দেরই সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ মতিদাসকে সেই শিখ অভ্যুদয় কালে করাত দিয়া বিদীর্ণ করিয়া মারা হইয়াছিল। ধরাপড়িবার মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রামরাখি পরমাসুন্দরী পূর্ণবয় যুবতী ছিলেন। স্বামীর ধরা পড়িবার পর হইতেই ইনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং নানারূপ আত্মনিগ্রহে দিন কাটাইতে থাকেন। পরে স্বামীর মৃত্যুদণ্ডা-দেশ শুনিয়া স্বামীর সহিত দেখা করিতে যান। কিন্তু তাঁহার জীবন সর্ব্বস্বকে তাঁহার মর্ম্মাশ্রু যেন ভাল করিয়া দেখিতেই দিলনা। বাড়ি ফিরিয়া একরূপ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দিন কাটাইতে থাকেন। একদিন স্বীয় কক্ষ হইতে শুনিতে পাইলেন বাহিরে যেন একটা চাপা ক্রন্দন রোল উত্থিত হইয়াছে। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীমতী রামরাখি সব বুঝিতে পারিলেন। এবার আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, সতীসাধ্বী সুস্থ নীরোগ দেহে স্বামীধ্যানে বসিয়া যেন স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া গেলেন; মাটিতে মিলাইবার জন্যই শুধু দেহখানি পড়িয়ারহিল। এরূপ স্বামীপ্রেম, এরূপ আত্মোৎসর্গের তুলনা কোথায়? ধন্য বালমুকুন্দ! ধন্য বালমুকুন্দের স্ত্রী!! হায়রে ভারতের অদৃষ্ট! এমন স্বামী এমন স্ত্রীও তোমার কপালে সইল না!!

(ক্রমশঃ)

সুখের ঘর গড়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(তারার কথা)

পর দিন বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় ভবানীপ্রসাদ তাহার বৌদিদির নিকট বসিয়া তারামণির পিসির দুর্ঘটনার কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন ; বৃদ্ধার অবস্থা শুনিয়া নয়নতারা দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় ভবানীপ্রসাদ তারার মেয়ে সন্ধ্যার গুণের পরিচয় দিল। "সত্যি বউদি, ভাল বংশের মেয়ে যে তার ভুল নেই—"নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন "তাতে ভুল হবার আছে কি ? বাউনের ঘরের মেয়ে—তার ওপর বাপ ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোক, ভালরকম চাকরীই করতেন, আজ না হয় দুরবস্থায় পড়ে তোমার বাড়ী রাঁধুনীগিরি করছে তাতে কি আর বংশের গুণ উপে যাবে ?" ভবানী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না তাই কি হয় ? আমি তাই-ই বলছি সাধারণ রাধুনীর ধরণ ধারণ লক্ষণ নয় —সত্যি বউদি ভারি চমৎকার মেয়েটি" নয়নতারা চাপা কৌতুকে দেবরের মুখের ভাব ও মনের প্রীতিমাখা প্রফুল্লতা দেখিয়া রহস্য করিয়া বলিল— "গুণেরই তো পরিচয় দিলে, আর অমন যে চমৎকাররূপ তা বুঝি চোখেই পড়ল না ?" এমন ভাবে টানিয়া হিঁচড়াইয়া ভবানীর মনোগত নীরব রূপ প্রশংসাটীকে বাহির করিয়া সুমুখে ধরাতে সে লজ্জিত হইয়া বলিল— হ্যাঁ দেখ্‌তেও বেশ —"

ন। বেশ্‌ তো বটেই ! যেন কত দয়া করে তারিপ করছ ; অথচ ঐটেই তোমার ভালকরে আগে প্রশংসা করা উচিত ছিল—

ভ। কথ্‌খনো না, ভদ্রলোকের মেয়ের রূপের প্রশংসা অপরিচিত পুরুষের মুখে শোনায়না ভাল—

ন। তার কারণ কি জান ? মানুষের রূপ জিনিষটাকে আমরা একটা মন্দ ভাবের সঙ্গে সংযোগ করে দেখি বলে নয় কি ? একটা বাসনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করে রাখার জন্তে এই ভয় সংকোচ ; গুণের মত রূপকেও যদি আমরা ভক্তির চোখে পবিত্রভাবে দেখ্‌তে শিখতাম তা হলে এ সংকোচ হতো না— জোর করে সমানে বলতে পারতাম—বাঃ পুরুষটীর বা স্ত্রীলোকটির কি সুন্দর রূপ !" তা বল্‌তে পারলে নিজেদের মনের সরলতারই পরিচয় দিতে পারতাম,

রূপেরও ঠিক সম্মান করতে পারতাম। যাই বল আর যাই কর ভাই, আমাদের দেশের লোকেরা ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দানকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার ক'রে তার মর্য্যাদার ন্যায্য সম্মান দেখতে পারে না—

ভ। সত্যি বউ দি, ভোগের সঙ্গে দেহের রূপকে আমরা এমনি মিশিয়ে ছোট আর হীন করে দেখতে শিখিছি—

ন। সত্যি নয় কি? আকাশের সন্ধ্যার রংবাহার বা ফুটন্ত গোলাপের বর্ণ মাধুরী দেখে আমরা কেমন সরল মনে বলে উঠি বা কি সুন্দর! পারিনি শুধু মানুষের রূপের এম্‌নি ভাবে প্রশংসা করতে! সে যাক্—

ভ। আচ্ছা বৌদি মেয়েটিতো বেশ বড়ই হয়েছে; ওর মা না জানি তার বিয়ের ভাবনায় কতই অস্থির হয়েছেন—

ন। তা আর হয় না? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, তারপর গরীব—ভাবনার কি আর কুল কিনারা আছে? টাকা অত পাবে কোথা?

ভ। তা তো বটে সইত্যি বৌদি—

ন। তবে যদি কোনো বড়লোকের ছেলে মেয়েটির গুণ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিনিপণে তাকে বিয়ে করে ফেলে তার মাকে দায় উদ্ধার করে তবেই রক্ষে তা লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে মেয়ের কপাল বা ফলে—

ভবানী হাসিয়া লজ্জানত মুখে বলিল—"বৌদি কিন্তু খুব যাহোগ, আমি যেন কথার ধাচ্‌ বুঝিনি—

নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন "আমিও যেন মনের ভাব বুঝিনি"

ভ। একটি মেয়েকে ভাল বল্লেই বুঝি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে জানানো হয়?

ন। হলেই বা দোষটা কি? ভালঘর, ভালবংশ, রূপ গুণ দুই-ই আছে তবে বলতে পার রাধুনীর মেয়েকে জমীদারের ভাইপো হয়ে বিয়ে করতে পারে?

ভ। আমি মানুষকে অত ঘেন্না করিনি। গরীব হওয়াটাই কি এত অপ-রাধ বৌদি?

ন। তুমি না করতে পার,তোমার অভিভাবকরা করেন। সে যাগ তা হলে ঐটিকে রাণী করবার ইচ্ছে হয়েছে?

ভ। বা! বা! তাই বুঝি বললুম আমি?

ন। তা হলে মুখের প্রশংসা শুধু?

ভ। এও তো মুস্কিল খুব! প্রশংসা করলেই বিয়ে করতে হবে? তা হলে তো কাকেও ভাল বলবার জো নাই—

ন। আর যাকে কোনো কালে দেখলাম না বুঝলাম না, কোনো পরিচয় পেলাম না তাকেই বিয়ে করতে হবে?—না হয় এটিকে বৌ করলে?

ভ। বলিছি তো বউদি বিয়ে আমি করবো না—

এমন সময় রান্না ঘরের দিকে মহেশ পত্নীর কর্কশ কণ্ঠ নিঃসৃত গর্জ্জন শোনা গেল, ভবানী বলিল, "কিসের অত চেঁচামেচি? পিসিমা কাকে বকছেন?"

নয়ন। হয়েছে; বুঝিছি—তুমি তারামণিকে বারণ করে এসেছিলে আস্‌তে, তাই হয়েছে রাগ 'কে রাঁধবে?' আমি বল্লাম "তাতে কি পিসিমা ওর বিপদ অ ন্, কি করে আস্‌বে? আমিই চালিয়ে দেবো ক'দিন—" তাতে কত কথাই শোনালেন; সন্ধ্যা বেলায় ঘর থেকে শুনলাম ঝিকে হুকুম করছেন, তার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিতে বলো সকালে। সেই বা এসেছে তাকেই বকৃছেন্ চলতো ব্যাপার কি দেখে আসি—'ঐ মেয়ে পারে এই হেঁসেলের ধাক্কা সাম্‌লাতে?', এই বলিয়া ভবানী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয়ে রান্না ঘরে ঢুকিয়া দেখেন—সত্যই সন্ধ্যা কাজে আসিয়াছে। জলন্ত উনানে একটা প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়ী, তার কানাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা ভয়ে, লজ্জায় ও তিরস্কারের নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মাহত হইয়া দু হাতে দুটা ন্যাতা লইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; গৃহিণী কাদম্বিনী দেবী বর্ষার কালো মেঘের মত গর্জ্জন করিতেছেন ও গালি দিতেছেন—একধারে আহ্লাদীর মা বুড়া ঝি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বাটনা বাটিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মনিবপত্নীর তিরস্কার বাক্যকে টীকা টিপ্পনীর দ্বারা বিশদ করিতেছে।

ভবানীকে দেখিয়া সন্ধ্যা সন্ধ্যারই মত হইয়া গেল; ভবানীর সম্মুখে তাহার অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় বাহির হইয়া পড়িবে আর ভবানীর সম্মুখে থাকিয়া তাহাকে এত নিন্দা ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে, জানি না এ ভাবনাটা কেন সন্ধ্যাকে এত মলিন করিয়া দিল। অথচ আশ্চর্য্য এই তাহাকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে পরমুহূর্ত্তেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনুত্তরনীয় এই সংকটে যেন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইল।

দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তে দেবর ভাজ ব্যাপার খানা বুঝিয়া লইলেন। উভয়কে দেখিয়া কাদম্বিনী একটু সুর নরম করিয়া কিন্তু বাক্যের বিষ তেমনি মাত্রায় রাখিয়া বলিলেন "অত বড় ষোলো বছরের ধেড়ে মেয়ে একটা হাঁড়ি নামাতে

পারেন না—এমন নয় বাপু যে কখনো রাঁধিনি--বাড়ীতে তো পিণ্ড সেদ্ধ দুবেলা হয়—"

ভবানীর অসহ্য হইল সে বলিল "পিসিমা তুমি কি গো? একটু দয়া মায়া নেই? অই অত বড় হাঁড়ী বাগাতে পারে? শুধু শুধু গাল দিচ্ছ—"; নয়নতারা বলিল "বলিছিলামতো মা যে আমিই কদিন রাঁধ্‌বো, কেন মেয়েটীকে কষ্ট দেওয়া?"

কাদম্বিনী ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"করলে না কেন মা এসে? আসল কথা তা ত নয়—পেকারান্তরে বলা তুমি কি কচ্ছ বসে বসে? দুদিন রাঁধলেই পারতো—তা কি আর পারিনি বাছা! না পাল্লেই বা হবে কি করে? গতর না খাটালে ভাত দেবেই বা কে?—"

ন। আমি কি এই-ই বললাম পিসি মা? কেন অনর্থ কাণ্ড তুচ্ছ কথা নিয়ে বাধাও বলতো?

কা। আমিই তো বাধাই গো- আমার স্বভাবই যে তাই - না মা! আমার দেখছি এগুলেও আঁটকুড়ীর ঝি পেছুলেও তাই—দাসদাসী লোকজনকে কোনো কথাই যে আমার বলবার জো নেই—এতো জ্বালা কম নয়!

ভবানী কোনো কথায় যোগ না দিয়া আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যার হাত হইতে ন্যাতা লইয়া আপনি সাবধানে কানা ভাঙ্গা হাঁড়ীটা নামাইয়া দিল। "বাবা! এই হাঁড়ী ওই কচিমেয়ে নামাতে পারে?—"

ন। আমি তোমাকে কখন গতর খাটাবার কথা বল্লাম পিসিমা? কেন মিথ্যে অপবাদ দিয়ে অশান্তি ঘটাও—লোকজনকে বলতে কে মানা করেছে? বলার ত একটা ধাঁচ ধরণ আছে?

কা। ধাঁচ ধরণ কি আমরা জানি মা? পাড়াগেয়ে ভূত আমরা—তোমার মত রাজার বৌ হতুম তো ধাঁচ ধরণ শিখতুম। কি কথা গো! বাউনি মাগী মিথ্যে ওজর করে বাড়ী বসে থাক্‌বে আর আমি কোনো কথাই বল্‌তে পাব না?—আঃ রে পোড়া পেটের ভাত!

নয়ন। (উত্তেজিত হইয়া) তুমি বলছ কি পিসিমা?

ভবানী। বাস্তবিকই ত পিসিমা কথাগুলো তোমরা কেমন সহজে এলোধাপাড়ী বলে যাও, কাকে কোথায় কতটা বাজে তা একবার ভাবনা—বাউন মেয়ে মিথ্যে ওজর করেনি, আমি সাক্ষী।

পি। ও বাবা তা হলে আর কথা আছে! আমার ঘাট হয়েছে বাবা, ঘাট হয়েছে, বৌ মা! লোকজনকে আমার কিছুই বলা উচিত নয়—

ভ। কেন বলবে না?

পি। তার কারণ তারা আর আমি এক জাতের; গতর খাটিয়ে তারা ভাত মাইনে পায় আমি শুধু ভাতই পাই! দোষ আমারই যে?—জমীদারের বউ আর বোন এই দুয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ—যতই দিন যাচ্ছে ততই বুঝছি—

'কি হয়েছে কাদু?' বলিয়া রতন রায় ঘরে ঢুকিলেন "এত চেঁচামেচি কিসের?" নয়নতারা ও ভবানী সরিয়া দাঁড়াইল, কাদু ভাইকে দেখিয়া একেবারে মূর্ত্তিমতী দীনতা হইয়া পড়িল। কাদু কাঁদুনে সুরে বলিল 'চেচামেচি করি আমি; যার এবাড়ীতে জোর কম তার গলা বেশী বড় হবেই তো!

র। কি পাগ? সোজা কথা কি তোমরা কইতে পার না? যেমন বোনটী তেমনি বোনাই। সোজা সাদা কথায়—

কাদু। আমরাই তো হয়ে পড়িছি যত উৎপাতের।

র। বলি ব্যাপারটা কি তাই বল না? কি হয়েছে বৌ মা?

নয়নতারা যথাযথ যা ঘটিয়াছে তাহাই বলিলেন—শুনিয়া রতন রায় ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এই তো কথা? না?"—

কা। অমনি করে বল্লে অম্‌নি দাঁড়ায়—বিশেষ উনি তোমার বউ; আর এ হ'ল ব্যাটার মত। আমি তোমার অন্নদাসী। যাগ্‌ দাদা যা হয়েছে তা হয়েছে পেটে খেলে পিঠে সয়—"

এই বলিয়া কাদম্বিনী চকিতের মত গৃহ ত্যাগ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া সকলেই নির্ব্বাক রহিল। তারপর রতন রায় ভ্রাতস্পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"দেখ বাবাজী; তুমি দেখ্‌ছি ক্রমশঃই অসহ্য করে তুল্‌ছো! সব বিষয়ে সব স্থানে সব কথাতেই দেখছি ঘোঁড়া ডিঙিয়ে ঘাস্‌ খেতে আরম্ভ করেছ; বলি কেন বলতো? শুধু বাইরের সরকারী বে-সরকারী ব্যাপারেই নয় বাড়ীর ভিতর ও ঘরগেরস্থালীর ব্যাপারেও মেয়ে ন্যাকড়ার হদ্দ হয়ে উঠছো তোমার যদি আমার বেঁচে থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে কর্ত্তালি করবার সাধ হয়ে থাকে তা বলো আমিও আমার মনের ভাবটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দি?"

নয়নতারা দেবরকে এমনি ভাবে অকারণ তিরস্কৃত হইতে দেখিয়া তাহার হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, রতন রায় তখনি তাঁকে বাধা দিয়া বলিলেন—থামো বৌ মা—আমার কথা শেষ করতে দাও—কি বলছিলাম—কিন্তু

আশা এখন তোমায় স্থগিত রাখ্‌তে হবে পরমায়ু আমার আছে আমি গদী ছাড়ছিনি এ জেন, আর আমি আমার ইচ্ছে বুদ্ধিতেই চল্‌বো ও সবাইকে চালাবো আর তোমার মত চ্যাংড়ার কর্ত্তামি সহ্য করবো না—একটা কথা জান্‌তে চাই সে দিন ভোলা মাষ্টারের বাড়ীতে বাউন ভোজনের ব্যাপারে তুমি কেন গিয়েছিলে ? এবং গিয়েইছিলে যদি কেন তুমি ওই বর্ব্বর ব্রাহ্মণের হয়ে চৌধুরীকে সভামধ্যে অপমান করেছিলে ? উনি শুধু তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ নন, উনি তোমার পিসে, গুরুজন, আর উনি নিজের মত অনুসারেই যে এই ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তা নয়, নিশ্চয়ই এতে আমারও সম্মতি ছিল ; আর না থাক্‌লেও উনি নিজে গ্রামের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ; . নিজে সবদিক ভাল বুঝেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন, এক্ষেত্রে তোমার মাঝ হতে গায়ে পড়ে কর্ত্তামি করবার কি দরকার ছিল ; তারপর একটা সামাজিক ব্যাপার, গ্রামের জমীদারের যতটা মীমাংসা করবার বা যথাযথ দেখবার অধিকার আছে ততটা তার একজন নগণ্য প্রজার নেই ; এসব বুঝে সুঝেও তুমি কি জন্য বাড়ীর অপমানটা সভার মধ্যে নিয়ে এলে শুনি ? মোদ্দা কথা, এদানীং দেখছি তুমি কিছু বেশী রকম মাতব্বর হয়ে উঠেছো।— কিন্তু আমি যদ্দিন বর্ত্তমান তদ্দিন তোমার এ সব মুরব্বী আনা কিছুতে সহ্য কর্‌তে পারবোনা ; যখন তোমার আমল আস্‌বে তখন তুমি যা হয় করো এখন যেমন মানুষ তেমনি থাক্‌বে যা বুঝি আমি। কাজ না থাকে, লেখাপড়ায় ইস্তফা দিতে হয় দাও কিন্তু সোজা কথা যা বুঝি, এখন তুমি না হয় অন্যত্র—”

নয়নতারা কথাটার ইঙ্গিৎ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি শ্বশুরকে হাত জোড় করত নিরস্ত করিয়া বলিলেন “বাবা আপনার পায়ে পড়ি, ও সব কিছু মনে করবেন না, ঠাকুর পো আপনার ছেলের মত, অবুঝ হয়ে যদি কিছু করে থাকে তার জন্যে—”

ভবানীও বৌদিদির কথার আঁচ বুঝিয়া বাধা দিয়া বলিল—‘না বৌদি ওঁকে বল্‌তে দিন ; কাকা বাবু যা আদেশ করছেন আমি তাইই করবো ; সত্যই আমার এখানে থাকাই আর উচিৎ হচ্ছেনা—আমি আমার নিজের অবস্থা আর মূল্য বুঝতে পেরেছি—আমি আর কিছুতে থাক্‌তে চাইনি যেমন ছিলাম—

রতনরায় বলিলেন—“হ্যাঁ কলকাতায় যেমন ছিলে তেমনি থাকগে মাসে মাসে খরচ পাঠাবো যা খুসি তাই করো—সোজা কথা যা বুঝি—যখন তোমার

সময় হবে এখানে এসে রাম রাজত্ব কর—" এইবলিয়া রতনরায় ক্রোধ সংযত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

নয়ন তারা দেবরকে বলিলেন—"ঠাকুর পো, রাগ করনা, রাগ করে একটা হটকারিতা দেখিও না কলকাতায় গিয়ে বাস করবে কেন শুনি ?"

ভ। এখানে বাড়ীতে এমনি ভাবে থাকৃতে বলো বৌদি ?

ন। বলি, একশোবার বলি—পিতৃতুল্য গুরুজন, অভিভাবক যদি দুটো কড়া কথা বলেন—

ভ। কড়া কথার জন্যে নয় বৌদি—বাপ মা খুড়ো জ্যাটা কড়া কথা বলবেনা তো বলবে কে ?

ন। তবে ?

ভ। আমি থাকৃতে চাইনি এই জন্যে যে এখানে থাকৃলে আমার মনুষ্যত্ব দিন দিন হীন হয়ে আস্‌বে। আমি চোখের উপর এই সব অত্যাচার অনাচার যার প্রতিকার করতে পারবো না তা সহ্য করতে পারবো না। নিজে যা ভাল বুঝবো তা যদি করতে না পারি তা হলে আমার শুধু খুড়োর অন্নদাস হয়ে পড়ে থাকা আমার মনে জ্ঞানে অন্যায় বলে বোধ হচ্চে। কাজ কি বৌদি এমন হয়ে হীন হয়ে জীবন ধারণ করা ? খুড়োমশাই বা পিসে পিসি মনে করছেন আমি জমীদারীর লোভেই বুঝি লোকের কাছে প্রিয় হবার চেষ্টা করছি তার দরকার নাই ; আমি গরীব গেরস্তর ছেলে, গরীবানা ভাবেই থাকৃতে চাই ; কলকাতাতেই গিয়ে থাকৃবো, চাকরী একটা জুটিয়ে নিয়ে নিজের পেট চালাতে শিখ্‌বো—

বৌ। ছি ঠাকুরপো পাগলামি ছাড়— আর এক কথা আমি কি কেউ নই ? আমার মায়া কাটাতে তুমি পার আমি কি করে তোমার মায়া কাটাবো ?

ভ। পাগলামি আমার না তোমার বৌদি ? আমি এই বাড়ী ছেড়েই যেতে চাই— তোমায় ছেড়ে তোমার মায়া কাটিয়ে যাব এ কথা কি ক'রে সিদ্ধান্ত করলে ? আমি কি গ্রাম ত্যাগ করছি বৌদি ? আমি যেখানেই যাই বা থাকি তোমার স্নেহ মমতা মায়া আমাকে সেইখান হতে টান্‌বে—ও কথা বলো না বৌদি আমার মা নেই তুমি আমার মা হয়ে মানুষ করেছ তা আমি ভুলিনি ভুলবোও না—যখন ডাকৃবে তখনই আস্‌বো, না ডাকৃলেও আস্‌বো সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব নইলে আমায় কে দেখ্‌বে ?

বৌ। না না ও সব মতলব ছাড়—বিবেচনা হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছ—পিতৃতুল্য খুড়ো একটা কড়া বলেছে আর অমনি গৃহত্যাগ করতে বস্‌লে ? তার

মনে কষ্ট হবে না? গুরুজনকে কষ্ট দিয়ে ভাল ফল হবে কি? এক কথায় এত রেগে যাও কেন? ভাই সংসার না জল-আগুন-কাঁটা ভরা অরণ্য, এখানে বাস করতে হলেই, জলে ভিজতে হবে, আগুনে পুড়তে হবে, কাঁটা বেধা সইতে হবে-- এখনি এত অধৈর্য্য হচ্ছ? তবে মানুষ হয়ে ফুটবে কি করে শুনি? পাঁচদিক হতে ঘা খাচ্ছ বলেইতো তোমার এক একটি গুণ ফুটে উঠছে? যেখানে কোনো জাল জঞ্জাল নেই সেখানে একা মুখ চোখ বুঝে পড়ে থাকাও যা আর মাটির মধ্যে মাটি চাপা পাথর হয়ে পড়ে থাকাও তা নয় কি?

ভবানী। বুঝি বৌদি কিন্তু—

ন। কিন্তু মিন্তু শুনছিনি—এখন যাও আবার কথা হবে—যা বললাম বুঝে দেখগে। ভাল কথা, হাঁড়ী নামালে হাত ধুলে না? ভুলে গেছ বুঝি?

ভবানী লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল "মনে ছিল না বৌদি একটু জল দাও।"

নয়নতারা সন্ধ্যাকে বলিলেন "দাওতো গা ঠাকুরপোর হাতে জল—"

সন্ধ্যা এতক্ষণ নীরবে দেবর ভাজের কথা শুনিতেছিল। আর মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া সভয়ে ভবানীকে সভক্তি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। নয়নতারার আদেশ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া জলের ঘটী লইয়া অগ্রসর হইল; ভবানী হাত পাতিয়া দিল. সন্ধ্যা লজ্জালাল মুখখানি নত করিয়া ভবানীর হাতে জল ঢালিতে গেল, কে জানে কেন হঠাৎ হাত কাঁপিয়া উঠায়—প্রয়োজন মাত্রাতিরিক্ত জল হাতে না পড়িয়া ভবানীর হরিণচর্ম্মের চটী দুটা ভিজাইয়া দিল। ভবানী হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বাঃ, বেশ জল দিলেতো?' সন্ধ্যা ভয়ে ও লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি নিজের অঞ্চল দিয়া চটী দুটা মুছাইয়া দিতে গেল; ভবানীও পায়ে হাত দেওয়া নিবারণ করিতে গিয়া সন্ধ্যার কচি দুখানি হাত ধরিয়া সরাইয়া দিল, "বলিল ছিঃ ছিঃ কি করছ? জুতো ভিজলোইবা।" একই মিনিটের মধ্যে এই ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। লজ্জাবতী লতা যেমনি স্পর্শ মাত্রে কুঞ্চিত হইয়া যায়, ভবানীর কর স্পর্শে সন্ধ্যা তেমনি লজ্জা সংকুচিতা হইয়া হেঁসেলের দিকে চলিয়া গেল। নয়নতারা হাসিমাখা কৌতুক দৃষ্টিতে এই সুমধুর দৃশ্যটুকু উপভোগ করিতেছিলেন। দুজনেই বাহিরে আসিলেন। সন্ধ্যার হাত ধরিয়া বাধা দেবার পরমুহূর্ত্তেই ভবানীর মনে একটা খটকা লাগিয়া গিয়াছিল; ভাবিল বৌদিদি না জানি কি মনে করিলেন? বৌদির মন হইতে সেই ভাবটা সরাইয়া দিবার জন্য বলিল—'মেয়েটী কি ভীতু বৌদি?

জুতোটা কি না আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে এসেছে!—” বৌদি একটু হাসির রসান দিয়া বলিলেন—“তা না এলে কি এই পানিপীড়নটা হতো ভাই? এখন হাতটা যে ব্যাচারার উচ্ছিষ্ট করে দিলে আর তো ও দুটী হাতে আর কেউ হাত দেবেনা?”

ভ। (লজ্জিত হইয়া) যাও বৌদি কি বল যে তার ঠিক্ নেই—যদি কেউ শুন্‌তে পায় একথা—কি মনে করবে?

ন। মনে করবে গন্ধর্ব্ব মতে কন্যালাভ হচ্ছিল আর আমি বৌদিদি তার সাক্ষী বা পুরোহিত ছিলাম—

ভ। বিয়ে এত সস্তা নাকি বৌদি? যেখান হ'তে হোগ যাকে হোগ্ কুড়িয়ে এনে একটা বিয়ে করলেই হলো নাকি?

ন। এটা তোমার মনের কথা, না—আমার মন বোঝবার জন্যে তোমার মুখের কথা? যদি শেষটা হয় আমি কিছুই উত্তর দেবই না—

ভ। যদি মনের কথাই হয় বৌদি?

ন। তবে বলবো কি জান? তুমি মূর্খ, অন্ধ, অজ্ঞ, রত্ন চেন না—যদি চিন্‌তে তাহ'লে কাদা ধূলো মাথা একটী মণির কুঁচির জন্যে নিশ্চয়ই তুমি ছাই আস্তাকুড়, কাঁটাবোন, কিছুই বিচার করতে না—সকল কষ্ট ক্ষতি স্বীকার করে রাংতার খেয়াল ছেড়ে মণি টুকরাটাই জোগাড় করতে! আমার যদি তোমার বয়সী ছেলে থাক্‌তো আমি ঐ রত্নটী কুড়িয়ে ত দূরের কথা, ভিক্ষে করে এনে ছেলেকে দিতাম; ছেলে নেই তুমি আছ তার স্থান দখল করে, আমি ইচ্ছে করিছি ঐ রত্নকণাটী এনে তোমার কপালের টিপ করে দি?

ভ। না বৌদি আমার সেটা মনের কথা নয় সত্যি বলছি বৌদি—সে যাগ্ আচ্ছা ওটী যে কোহিনুরের টুক্‌রো তা কি করে জান্‌লে? পরিচয়টা কি ওই জুতো মুছিয়ে দেওয়াতেই পেলে?

ন। না ভাই সেদিন হাতে করে পুকুর পাড় হতে জুতো জোড়াটী; খাবার জলের কলসীর সঙ্গেই এক করে পৌছে দিয়েছিল ওই মেয়েটী নয়?

ভ। হ্যাঁ বৌদি।

ন। আরও পরিচয় চাও? একটী আমের একটুক্‌রো চাক্‌লেই বোঝা যায় কি জাতের আম? নয় কি?

ভ। হ্যাঁ বৌদি—কিন্তু সে যাগ্ রত্ন হোগ্। যদি আমার রত্নের লোভ না থাকে?

ন। আজ না থাক্, কাল হতে, পারে—দু বছর পরে হতে পারে ?

ভ। আর যদি নাই-ই হয় ?

ন। তুমি যে যিশুখৃষ্ট,চৈতন্য বা পরমহংস নও তা দিব্বি করে বল্‌তে পার ?

ভ। না—না ; এত আস্‌পর্দ্ধা রাখিনি।

ন। তবে চুপ কর।

ভ। না বৌদি ও সব মতলব করনা—তোমাকে জোড় হাত করে বলছি। আমার দিব্য রইল। আমার মানসিক অবস্থা ভাল নয় ; পরে তোমায় বলবো এখন ; বিয়ের অভাবে এখন রাজ্য বয়ে যাচ্ছে না।

ন। আচ্ছা কিন্তু তুমিও আমার অনুমতি ব্যতীত আর কোথায়ও যেন স্বয়ংবর হয়ে বা করে বসো না কেমন ?

ভ। হ্যাঁ সে ভয় নেই।

ন! আমার একটু ঠাকুর ঘরে কাজ আছে যাই—

ভ। বৌদি একটা কথা, আমি যদি কলকাতায় চাকরী করে বাসা করি তুমি যাবেতো সেখানে ? আমায় কে দেখবে ?

ন। অনেক বারই ত বলেছি ভাই এ বাড়ী ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব কেন—আবার বুঝিয়ে বলবো—

ভ। আমাদের সাবেক মেটে বাড়ীতে যদি গিয়ে থাকি ?

ন। পরে এসব কথা শুনবো—

ভ। আচ্ছা।

এই বলিয়া দুজনে যে যার কাজে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

ডালি

গান্ধিজী

[শ্রীশ্রীনিবাশ শাস্ত্রী]

দৈনন্দিন জীবন হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। গান্ধীও এই অটুট সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। কেন না জীবনের অস্বাভাবিকতা বিদূরিত করিয়া উহাকে স্বভাব ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য— যাহাতে জীবন সরল ও পবিত্র হইয়া উঠে। ঘটনা চক্রে কখন বা তাঁহার কার্য্য

কলাপ কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ; কখনও বা রাজশক্তির সম্মুখীন হইয়া তিনি শাসকের রোষাগ্নি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিতেছেন; কখনও বা তাঁহার ভারতের স্বরাজের বাণী সমগ্র পৃথিবী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে আর সমস্ত জগৎ তাঁহার স্বরাজের স্বরূপ জানিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া আছে। তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য হইতেছে মনুষ্য জাতির আমূল আত্যন্তিক সংস্কার। 'স্বভাব ধর্ম্মে ফিরিয়া আইস্' ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র। তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘোর বিরোধী। তাঁহার স্বরাজ আন্দোলন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বৃহৎ সংগ্রামের অঙ্গমাত্র। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সেই বিশাল সংগ্রাম পরিচালিত হইবে সেই পদ্ধতিতেই স্বরাজ আন্দোলন চলিতেছে; যে যে অস্ত্র শস্ত্র সেই বিশাল সংগ্রামে ব্যাবহৃত হইবে, তাহাই এই স্বরাজ সমরে ব্যবহৃত হইতেছে; যে যে গুণরাজিতে ভূষিত হইলে কালক্রমে সেই বিশাল সংগ্রামে জয়ান্বিত হওয়া সম্ভব স্বরাজ সাধনায় ও সেই সেই গুণেই তিনি ভূষিত হইতে বলিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংগ্রাম ও স্বরাজ সাধনা উভয়েরই মূল সূত্র অহিংসা। অন্তরে ও বাহিরে নিরুপদ্রব হও। কায়-মনোবাক্যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট সাধন করিও না। তাঁহার নিকট ব্যক্তিগত ভাবে কেহই শত্রু নন। তোমার প্রতিপক্ষ এই আত্মিক বল মানিতে চায় না বলিয়া তোমাকে অনেক নির্য্যাতন ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। নির্য্যাতনেও ক্ষতি, হর্ষ প্রকাশ কর, সানন্দে উহাদিগকে বরণ করিয়া লও। যদি এই দুঃখ দৈন্য প্রফুল্ল বদনে বরণ করিতে না পার, দূরে সরিয়া দাঁড়াইও না বা কোন অভিযোগ আনিও না। শত্রুকে ভালবাস - যদি ভালবাসিতে পার ক্ষমা চাহিও কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না। পশুশক্তি পরিহার্য্য সুতরাং উহা দমন করিয়া রাখিও। আত্মিক বল দুর্দ্ধর্ষ সুতরাং সেই অজেয় শক্তি অর্জ্জন কর। যাহাই ঘটুক না কেন সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইও না— সত্যের জয় অনিবার্য্য। এই মূল নীতি হইতেই স্বরাজ সংগ্রামের সফলতার জন্য অন্যান্য কয়েকটী বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বর্ত্তমান ব্রীটিশ শাসন যন্ত্রের হাত হইতে আমাদিকে মুক্ত হইতে হইবে সুতরাং এই উভয় শয়তান সন্তানের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক রাখিব না। যে সকল বিশালও শক্তিশালী অনুষ্ঠান আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিতে সহায়তা করিতেছে,তাহা হইতে সকল সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই হইল বিদ্যালয়, আদালত ও ব্যবস্থাপকসভা। বিদ্যালয় পরিত্যাগ কর, ন্যায় বিচারের

আশায় আদালতে নালিশ রুজু করিও না ; কখনও ভোট দিতে যাইও না। যন্ত্র সমূহ সয়তানের আবিষ্কার আর কলকারখানা ভারতে ব্রীটিশ প্রাধান্ত স্থাপনের প্রধান অবলম্বন অতএব দুইই বর্জ্জন করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিও না, প্রতিগৃহে চরকার ব্যবস্থা কর। চরকার গতিতে নিগূঢ় শক্তি নিহিত রহিয়াছে—আত্মা পবিত্র হয়। এই চরকায় প্রস্তুত বস্ত্রই মনুষ্যদেহের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির।

গান্ধীর জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে হইলে, যে সকল নিয়ম গঠন করিয়া তিনি আমেদাবাদ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠানের নাম সত্যাগ্রহাশ্রম। আশ্রমটি অদ্যাপি ক্ষুদ্র।

ইহার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই প্রতিষ্ঠাতার শক্তি নানা কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে সুতরাং ইহার জীবনীশক্তির পরিচয় দিবার অবসর আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যের সাফল্য দুইটি সর্ত্তের উপর নির্ভর করিতেছে, প্রথমতঃ সংখ্যাবৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ তাহার অল্পসংখ্যক ভক্তবৃন্দ যে কঠোর আদর্শে জীবনযাপন করিতেছে সে আদর্শ সাধারণের বিনা আপত্তিতে গ্রহণ। ভবিষ্যতে ইহার প্রভাব কি পরিমাণে হইবে অনুমান করিবার পূর্ব্বে তাহার নূতন গীতার সত্য প্রকৃতি বিশদ ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। নির্ম্মল সত্য সেইখানেই কেবল বিরাজ করে, যেখানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। সকল প্রকার বল-প্রয়োগ ও বাধ্যকরণ সে হেতু বর্জ্জনীয়। অন্তরে অন্তরে যে বিদ্রোহী তাহার নিকট বাধ্যবাধকতা, প্রভুত্বও শাসন উন্নতির অন্তরায়। তিনি কখনও বলেন তাহার ধর্ম্মের সার প্রেম। কখনও বলেন সত্য, কখনও বলেন অহিংসা। তাঁহার নিকট ইহার সকলেরই এক অর্থ। আদর্শজগতে কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনই সমর্থন যোগ্য নহে। বৃটিশ শাসনের গুণ এই যে, ইহাতে ব্যক্তিগত —স্বাধীনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি পরিবারে ও বিদ্যালয়ে স্নেহ ও নৈতিক যুক্তির বলের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিবে। উৎকট অশিষ্ট অপরাধের স্খালন কল্পে তিনি নিজে শাস্তি গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্ম উপবাস করেন। প্রতিবারেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোষীপক্ষ অনুতপ্ত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলে ভীষণ ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্ম তিনি এই উপায় অবলম্বন করেন—পাপের ভয়ে কলের কর্ত্তারা যুক্তি সঙ্গত সর্ত্ত মানিয়া লয়েন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজ-কুমারের আগমন প্রাক্কালে বোম্বাই নগরে অসহযোগের নামে কয়েকজন ব্যক্তি বল প্রয়োগ করায় তিনি

আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত এই উপবাস গ্রহণ করেন—ইহার ফলও সর্ব্বতোভাবে আশানুরূপ হইয়াছিল। এই আন্দোলনে যতটা অত্যাবশ্যক তাহার অধিক কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অভাবের অধিক গ্রহণ করা চৌর্য্য অপরাধের তুল্য। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন। অনেক বৎসর বিচক্ষণতার সহিত তিনি আইন ব্যবসা করিয়াছিলেন—কিন্তু আজ কয়েকখানি পরিধেয় বস্ত্র এবং ঐগুলি ধারণের জন্ত একটি থলিয়াই তাহাদের সর্ব্বস্ব। আমেদাবাদ আশ্রমে কেবল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী রহিয়াছে।

আপনার পরিশ্রমের দ্বারা প্রত্যেকে আপনার অভাব মোচন করিবে। যে শস্য তুমি ভক্ষণ কর, নিজের হাতে উৎপাদন করিবে, যে বস্ত্র পরিধান কর স্বহস্তে বয়ন করিবে ইহাই তাহার আদর্শ। যাঁহারা মস্তিষ্কের পরিশ্রম করেন, তাঁহারাও এই দৈহিক পরিশ্রম হইতে রেহাই পাইবেন না। বাস্তবিকই তিনি চরকার উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইহার সঙ্গীতে মুগ্ধ। ছাত্রগণ পুস্তক ফেলিয়া চরকা চালাক; আইন-ব্যবসায়ী জীবগণ মামলা ফেলিয়া চরকা গ্রহণ করুক, চিকিৎসকগণ রোগপরীক্ষার যন্ত্র ফেলিয়া চরকা ঘুরাক। অস্তাবধি চরকার প্রস্তুত বস্ত্র বড় মোটা—কিন্তু তিনি বলেন স্ত্রী কি পুরুষকে স্বহস্ত-প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করিলে যেরূপ দেখায়, অন্য কিছুতে সেরূপ দেখায় কি? তাঁহার একটি ছাত্রী স্বহস্ত প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইলে, তিনি বলিলেন যে তাহাকে দেবীর ন্যায় দেখাইতেছে। তাঁহার চক্ষে তিনি ঐরূপই দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনে ঐ রূপই বোধ হইয়াছিল—সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইহা বড় কঠিন ও সময়সাপেক্ষ—কিন্তু ইহা নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মমভাবে পালন করিতে হইবে। ভোগবিলাস সর্ব্বদা পরিহর্ত্তব্য। ভোগকে দিন দিন কমাইয়া আনিতে হইবে। রসনাকে দৃঢ়রূপে সংযত করিতে হইবে। সামান্য আহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আশ্রমবাসীদিগকে চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে বলেন। দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিহার করিয়া ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে স্বীকৃত হইলে বিবাহিত দম্পতিকেও আশ্রমে গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত আছে বলিয়াই তিনি কল-কারখানা বর্জন করিতে বলেন। এগুলি সয়তানের রাজ্যের। কলকারখানায় শ্রমজীবীর মনুষ্যত্ব হানি হয় সুতরাং তাহার রাজ্যে উহাদের স্থান নাই। তিনি [illegible] ও [illegible] নিন্দা করেন ইহার সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র উঠাইয়া

দিবারও পক্ষপাতী। যখনই তিনি উহাদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হন, মনে বড় ব্যথা পান। দ্রুতগামী ও সহজগম্য গমনাগমনের উপায়গুলি কেবল অপরাধ ও রোগের বৃদ্ধি করিতেছে। ভগবান মানুষকে পা দিয়াছেন এই অভিপ্রায়ে যে যতদূর পদব্রজে গমন করা সম্ভব তাহার অধিক পথ তাহারা না যায়। সাধারনতঃ যাহাকে রেলপথের উপকারিতা বলা হয়, তিনি তাহাকে অপকারিতা বলেন যেহেতু এতদ্দ্বারা আমাদের ভোগ বৃদ্ধিহইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হইতেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রও তাঁহার কঠোর সমালোচনা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। তিনি বলেন ঔষধ সেবন করিয়া বাঁচা অপেক্ষা মরণ অধিক শ্রেয়! মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ সেদিন হইবে, যেদিন প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর সে নির্ভর করিবে এবং জীবনকে সহজ ও সরল করিয়া তুলিবে।

সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই সমুদয় উপদেশ বিকট ঠেকিবে সন্দেহ নাই কিন্তু মহাত্মার নীতিশাস্ত্রের ইহাই সারাংশ। মনে করিবেন না তিনি এইসকল নৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়া বা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, তিনি প্রাত্যহিক জীবনে অক্ষরে অক্ষরে উহা পালন করেন। তাহার পার্থিববস্তুর ত্যাগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পীড়িত হইলে তিনি চিকিৎসক ডাকেন না। তিনি সুখাদ্য গ্রহণ করেন না। স্বহস্ত-প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করেন এবং এই পরিচ্ছদে নগ্নপদে এমন কি ভারতলাটের নিকট উপস্থিত হন। তিনি লোক-ভয়ে ভীত নন অপরকে যাহা করিতে আদেশ করেন তাহাহইতে কখনও পশ্চাৎ পদ হন না। দুঃখ কষ্ট তাঁহার বড় প্রিয় যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস দুঃখ কষ্ট দ্বারাই আত্মিক উন্নতি সম্ভবিত হয়। তাঁহার হৃদয় সমবেদনা ও কোমলতায় সমুদ্রের ন্যায় অসীম। একদিন তাঁহাকে স্বীয় বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া কুষ্ঠরোগীর ক্ষতস্থান ধৌত করিতে দেখিয়াছিলাম। ফলতঃ তিনি ইন্দ্রিয় পূর্ণমাত্রায় সংযত করিতে ও আত্মজীবনে সন্ন্যাসীর কঠোর আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ জনসাধারণের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন এবং আপনাকে মহাত্মা আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি জাতি প্রথার সমর্থন করেন কিন্তু কখনও জাতির অহঙ্কারের অনুমোদন করেন না তিনি মনে করেন পূর্ব্বের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলে জাতিপ্রচার উপকারিতা আছে এবং এই বর্ণাশ্রমই হিন্দুধর্ম্মের মেরুমজ্জা। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চাহেন। তিনি তথাকথিত নিম্নজাতির উন্নতি করিতে

চান। তিনি বলেন যে সকল কর্ম্মী এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহাদের একস্তরে নামিয়া আসিয়া উহাদেরই ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। এই রূপেই যথার্থ সমবেদনা ও সহানুভূতি জাগিবে ও পতিতজাতির আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদের উন্নতি সম্ভবপর হইবে। তাহার অনুচরবর্গ জনসেবা ব্রতের সহিত রাজনীতি মিশাইয়া ফেলেন সেইজন্য অনেক সময় তাহাদিগকে কাজে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়। তাঁহার মত রাজনীতিক স্বাধীনতা জনসঙ্ঘের নিকট কিছুমাত্র প্রয়োজনে আইসে না সামাজিক দুর্নীতি যতদিন না দূর হয়। যুগপৎ সামাজিক সংস্কার না হইলে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

মহাত্মার শিক্ষার আদর্শ কি তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই। তবে সুন্দর সুন্দর ঐতিহাসিক গবেষণা অর্থনীতিক আবিষ্কার, কলকারখানাও নানা ভাবে ঋদ্ধি বৃদ্ধির উপায় তাঁহার ব্যবস্থায় স্থান পায় নাই! তিনি সমগ্র ভারতে এক ভাষা প্রচলন করিতে চান—তাঁহার মতে হিন্দিই সমস্ত ভারতের ভাষা হইবার উপযুক্ত।

আমি তাঁহার শিক্ষা সহানুভূতি পূর্ণচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছি। তাঁহার মহানচরিত্র—হৃদয়শুদ্ধির ক্ষমতা আমি অনুভব করিয়াছি। তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হৃদয়ে বল পাইয়াছি। এই জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা জাগিয়াছে। আর সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয়কন্দরে যে সম্পৎ বিরাজ করিতেছে তাহার ক্ষীণআভা পর্য্যলোকন করিয়াছি আর সম্ভ্রমে দেখিয়াছি—তাঁহার মহিমা মণ্ডিত জীবনের কত না সন্তাপ ও সংগ্রাম।

["Gandhi the man" প্রবন্ধের অনুবাদ]

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(তৃতীয় গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ইমন্——একতালা।

সৈনিকগণ।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আনন খানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধ-নয়নে চাহে;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি;
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

০ ১ ২´ ৩
II { না ধা ধা । না পা পা I র্মা পা পা । র্মা গা গা ।
য খ ন স ঘ ন গ গ ন গ র জে

---

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে 'নারায়ণে'র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

০ ১ ২´ ৩
। গা পা পা । হ্মা গা রা I হ্মা -পা -ধা । না -া -া } ।
ব রি ষে ক র কা ধা ० ० রা ० ०

০ ১ ২´ ৩
। { পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা ।
স ভ য়ে অ ব নী আ ব রে ন য় ন

০ ১ ২´ ৩
। সা -রা গা । গা -া গরা I হ্মা -পা -ধা । না -া -া } ।
লু প্ ত চ ন্ দ্র० তা ० ० রা ० ० } ।

০ ১ ২´ ৩
। { পা -ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা ।
দী প্ ত ক রি সে তি মি র জা ० গে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্রা র্রা । র্সর্রা র্গা র্গা I র্রা -র্সা -না । ধা -পা -া ।
কা হা র আ० ন ন খা ० ० নি ० ०

। ধুয়া } II

০ ১ ২´ ৩
II { গ গা -া রা । পা পা পা I পা -া পা । পা পা পহ্মা ।
জ্যোৎ স্ না হ সি ত নী ० ল আ কা শে०

০ ১ ২´ ৩
। গা গা রা । গা পা পহ্মা I গা -া -রা । সা -া -া ।
য খ ন বি হ গ० গা ० ० হে ० ०

০ ১ ২´ ৩
। স সা -গা গা । রা সা সন্‌া I ধ্‌া ন্‌া ধ্‌া । ন্‌া সা সা ।
স্নি গ্ ধ স মী রে० শি হ রি ধ র ণী

০ ১ ২´ ৩
। সা -গা গা । গা পা পহ্মা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
মু গ্ ধ ন য় নে० চা ० ० হে ० ०

০ ১ ২´ ৩
{ গা গা -পা । প পা পা পা I না ধা না । পা -হ্মা -গা ।
ত খ ন্ স্ম র ণে বা জে কা হা ० র্

০ ১ ২´ ৩
। ঋঋা গা ঋা । গা পা পজ্ঞা I গা -া -ঋা । সা -া -া ।
মৃ দু ল ম ধু র॰ বা ॰ ॰ ণী ॰ ॰

। ধুয়া } II ।

০ ১ ২´ ৩
II { পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্ঋা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা ।
আঁ ধা রে আ লো কে কা ন নে কু ঞ্ জে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্ঋা র্ঋা । র্সর্ঋা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্ঋা -র্সা -না । ধা -পা -া
নি খি ল ভু॰ ব ন না মা ॰ ঝে ॰ ॰

০ ॰ ॰ ১ ২´ ৩
। পা ধা পর্সা । র্সা র্সা র্সা I না ধা ননা । পা -জ্ঞা গা ।
তা হা রই হা সি টী ভা সে হৃ দ ॰ য়ে

০ ॰ ॰ ১ ২´ ৩
। ঋা গা ঋগা । পা পা পজ্ঞা I গা -া -ঋা । সা -া -া } ।
তা হা রই মু র লী॰ বা ॰ ॰ জে ॰ ॰

০ ১ ২ ৩
। { সা গা ঋা । সা সা ন্‌া I ধ্‌া ন্‌া ধ্‌া । ন্‌সা সা -া ।
উ জ ল ক রি য়া আ ছে দূ রে॰ সে ই

০ ১ ২´ ৩
। সা গা গা । পা পা পজ্ঞা I গা -া -ঋা । সা -া -া ।
আ মা র কু টী র॰ খা ॰ ॰ নি ॰ ॰

। ধুয়া } II

০ ১ ২´ ৩
II { গা গা গা । ঋা পা পা I পা পা পা । পা পা -জ্ঞা ।
ব হু দি ন প রে হ ই ব আ বা র্

০ ১ ২´ ৩
। সা গা ঋা । গা পা পজ্ঞা I গা -া -ঋা । সা -া -া ।
আ প ন কু টী র॰ বা ॰ ॰ সী ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। সা গা গা । ঋা সা সন্‌া I ধ্‌া ন্‌া ধ্‌া । ন্‌া সা সা ।
দে খি ব বি র হ॰ বিধু র অ ধ রে

০ ১ ২´ ৩

। সা গা -া । গা পা পহ্মা I গা -া -রা । সা -া -া } ।

মি ল ন্ ম ধু র০ হা • • সি • •

০ ১ ২´ ৩

। { গা গা পা । পা পা পা I না ধা না । পা -হ্মা গা ।

শু নি ব বি র হ নী র ব, ক ন্ ঠে

০ ১ ২´ ৩

। রা গা রা । গা পা পহ্মা I গা -া -রা । সা -া -া ।

মি ল ন মু খ র• বা • • ণী • •

ধুয়া :—

০ ১ ২´ ৩

। পা ধা -পা । র্সা র্সা র্সা I পা -ধা -না । ধা -পা -া ।

আ মা র্ কু টী র রা • • ণী • •

০ ১ ২´ ৩

। সা রা গা । হ্মা পা -া I নং নাং না ধা । পং হ্মাং গা -া } IIII

সে যে গো আ মা র্ হৃ দ য় রা• ণী •

দ্রষ্টব্য।—যে যে জায়গায় 'ধুয়া'—বলে লেখা আছে, সে সে স্থানে উল্লিখিত সুরে ও তালে 'ধুয়া' গেয়। বলা বাহুল্য যে এ গানখানি বহুল প্রচলিত গান; তাই মত্ বিশেষে গানটি একটু পরিবর্ত্তিত সুরেও গীত হ'য়ে থাকে, এবং পংক্তি বিশেষ বাদ্‌ও দেওয়া হয়। যাই হ'ক্! এখানে কিন্তু অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গাওয়া হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হ'ল।——লেখিকা।

শোক সংবাদ—চট্টলের প্রিয়কবি বঙ্গকাব্যকুঞ্জের একজন কলকণ্ঠপিক কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তাঁহার প্রতিভা-রবি মধ্যগগনে উপনীত হইয়াই অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। জীবেন্দ্রকুমার আমাদের নারায়ণের একজন নিয়মিত লেখক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহার অভাব নারায়ণের বুকে বড়ই বাজিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার স্বর্গগত আত্মা শান্তিলাভ করুক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

ভ্রম সংশোধন—গতবারের পঞ্চপ্রদীপে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'বীরভাবের কথা'র নিম্নে ভ্রমক্রমে প্রবর্ত্তকের নাম ছাপা হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত।

দ্রষ্টব্য—নারায়ণের ষাণ্মাসিক সূচী জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহির হইবে

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, [illegible] সংখ্যা]   [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

"জালিয়ানওয়াল বাগ-স্মৃতি"

(শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়)

ভারতের আজি পুণ্যদিন,
বালক, যুবক, বৃদ্ধ একসাথে হইয়াছে লীন
বিশ্বজননীর অঙ্কে;
আজিকার দিনে, এই ধরণীর পঙ্কে
ফুটিয়া উঠিল পুণ্য ত্যাগের কমল
শতবক্ষরক্ত হ'তে লভি' রূপ সুন্দর অমল।
নির্দ্দোষ যখন যেথা আপনারে দিল বলিদান
সেইদিন পুণ্যদিন, সেথা হ'ল মহা-তীর্থ-স্থান।
সুমহান্ আত্মত্যাগে যা'রা আজ হ'ল বরণীয়,
মরিয়া অমর হ'ল, হ'ল যারা চির-স্মরণীয়,
কি বাণী রাখিয়া গেছে ? কি মন্ত্র করিয়া গেছে দান ?
আকাশে বাতাসে আজি ধ্বনিতেছে সেই মহাগান—
"নির্ভয় যা'রা, দুর্জ্জয় তা'রা, লভিল যে জয়টীকা
জ্বাল গো আপন ললাটে দীপ্ত-সত্য-অমল-শিখা"
এ উদাত্ত সুরে আজি ভরি' লহ প্রাণ,
নির্ভয়ে আপনা ভুলি' গাহ আজ সত্য-জয়-গান,
কোটী-কণ্ঠ-সম্মিলিত-সুর বিশ্বে আজ হউক ধ্বনিত,
মিথ্যার আসন আজ ধূলায় লুটা'য়ে যাক্, হ'ক বিচূর্ণিত !

বহুদিন গেছি ভুলি' সত্যের মহিমা
দাসত্ব-অঙ্কিত-ভালে দিন দিন কলঙ্ক-কালিমা
হইয়াছে গাঢ়তর ;
দুর্দ্দশায় জর জর
ভিখারীর বেশে ফিরি' দ্বারে দ্বারে,
অপমানে অত্যাচারে
ভরিয়াছি ঝুলি !
আজি ভার হ'য়েছে দুঃসহ ; তাই হৃদয় আকুলি
শতাব্দীর পরে জাগে ঘোর অসন্তোষ,
নয়নের কোণে জলে ক্ষুব্ধ তীব্ররোষ !
ওরে মূঢ় চির-দাস !
নিজ হাতে আপনার গলে দিয়া ফাঁস
কার পরে কর রোষ ?
কার পরে এত অসন্তোষ ?
ভয়ে দুখে যা'র কাছে কর শির নত,
সে তোরে করিবে পদাহত—
এই বিশ্বনীতি !
পর-পদলেহী কবে লভিয়াছে শুদ্ধা বিশ্ব-প্রীতি ?
অতএব উঠ আজি,
সত্যের ভৈরব-ভেরী ঐ শুন উঠিয়াছে বাজি' ;
মুক্তির মন্দির-চূড়ে
বিজয়কেতন যেথা উড়ে
সকল বন্ধন-জ্বালা-শিখা
আঁখি মেলি' পড় আজ সে আগুন-লিখা—
"হও ধীর, হও বীর
নির্ভয়ে উন্নত কর শির
নির্ভয় যা'রা, দুর্জ্জয় তা'রা, লভিল যে জয়টীকা
জ্বালগো আপন ললাটে দীপ্ত সত্য-অমল-শিখা।"

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

চতুর্থ অধ্যায়।

(ক) জগতের ভাষাসমূহ।

জগতে যত প্রকার ভাষা চলিত আছে, তাহাদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভাষার অন্তর্নিহিত গঠনপ্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ চলিতে পারে (morphological classification)। ইহাতে ভারতের দ্রাবিড়ী এবং দক্ষিণ আফরিকার বান্টু ভাষা এক শ্রেণীভুক্ত হইবে (agglutinating) আবার দেশ হিসাবে ভাষার শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে— ইহাতে আমাদের বাঙ্‌লা ও সুদূর ইংলণ্ডের ইংরেজী এক শ্রেণীভুক্ত হইবে।

দেশ হিসাবে সাধারণতঃ জগতের ভাষাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয় :—

(১) আমেরিকান ভাষাসমূহ
(উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কথিত রেড্‌-ইণ্ডিয়ান্ ভাষাগুলি)

(২) উত্তর আফ্রিকার ভাষাসমূহ
(মিশর দেশের ভাষা এবং ঐ দেশের কপ্‌ট্ copt প্রভৃতি ভাষাগুলি)

(৩) মধ্য আফ্রিকার ভাষাসমূহ
(নিগ্রোজাতির ভাষাগুলি)

(৪) দক্ষিণ-আফ্রিকার ভাষাসমূহ
(বান্টু প্রভৃতি ভাষা)

(৫) প্রশান্ত মহাসাগরের ভাষাসমূহ
(ফিলিপাইনদ্বীপ প্রভৃতির ভাষা)

(৬) মালয়-পলিনেশীয় ভাষাসমূহ
(মালয় উপদ্বীপ, পলিনেশিয়া প্রভৃতির ভাষা)

(৭) উরল-আল্‌তাই ভাষাসমূহ
(উরল ও আল্‌তাই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভাষাসমূহ)

(৮) ককেশীয় ভাষাসমূহ
 (ককেশস্ প্রদেশের ভাষাগুলি)

(৯) চীন দেশীয় ভাষাসমূহ
 (চীন জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষাগুলি)

(১০) আরব্য ভাষাসমূহ
 (আরবী, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা)

(১১) দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহ
 (দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি)

(১২) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ
 (উত্তর ভারত হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত প্রচলিত ভাষার শ্রেণীবিশেষ)

(১৩) অবশিষ্ট ভাষাসমূহ
 (ইটালীর ইট্রাস্কান্—Etruscan স্পেনের সীমান্তবর্ত্তী বাস্ক্—Basque প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষাকে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

এই তেরোটি শ্রেণীর মধ্যে ভারতের সহিত দুইটি শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ—(১) দ্রাবিড়ী, (২) ইন্দো-ইউরোপীয়। আবার ইন্দো-ইউরোপীয়ের একটি উপশাখা ইন্দো-আর্য্য ভাষা হইতেই বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, এবং আধুনিক উক্ত ভারতীয় ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই উপশাখার কথা পরে বিস্তৃতভাবে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

(খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ।

এই শ্রেণীর ভাষাগুলির নাম 'ইন্দো-জার্ম্মাণ'ও বলা হয়। জার্ম্মাণির পণ্ডিতগণ প্রায়ই এই নাম ব্যবহার করেন। ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে ইংরেজী, ডচ্, বেলজিয়ান, সুইডিস, নরওয়েজিয়ান প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষা চলিত আছে, সবগুলিই আদি জার্ম্মাণভাষা হইতে উৎপন্ন। সেজন্য পূর্ব্বদিকের ইণ্ডিয়া ও পশ্চিমদিকের জার্ম্মাণির উল্লেখ করিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এখন আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও এই শ্রেণীর ভাষা চলিত হইয়াছে—কিন্তু তাহার অধিকাংশই আদি জার্ম্মাণ ভাষার বংশধর। এতদ্‌ব্যতীত জার্মাণ পণ্ডিতগণের নিজের দেশের নামটির প্রতি মমতাও ইহার মূলে আছে।

ইন্দো-জার্ম্মাণকে সাধারণতঃ ইন্দো ইউরোপীয় নামে অভিহিত করা হয়। ম্যাকৃসমূলর এই শ্রেণীকে আর্য্যভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এখন ইন্দো-ইউরোপীয়ের উপশাখা ইরাণীয় ও ভারতীয় ভাষা-শ্রেণীকে বুঝাইতে আর্য্যশব্দ প্রয়োগ করেন। কারণ এই দুই ভাষাভাষীরাই আদিতে নিজেদের আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় শাখাকে পণ্ডিতগণ দুইভাগে ভাগ করেন—"শতেম্" এবং "কেণ্টুম্" উপবিভাগ (Satem and Kentum groups) অর্থাৎ যে সকল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একশত বাচক শব্দে 'শ' আছে, তাহাদিগকে এক উপবিভাগ এবং যে গুলিতে 'ক' আছে তাহাদিগকে আর এক উপবিভাগে গণনা করা হইয়াছে। তালব্য এবং কণ্ঠ বর্ণের উচ্চারণ প্রভেদে এই বিভেদ করা হইয়াছে। জেন্দ ভাষায় "শতেন্" শব্দটি ও লাতিনে "কেণ্টুম্" শব্দটিতে একশত বুঝায় এই দুইটি কথা লইয়া উপবিভাগের নামকরণ হইয়াছে।

"কেণ্টুম্" ভাষাসমূহ—গ্রীক্, লাতিন, ইংরেজী, তুখারিয়ান্, হিটাইট্ ইত্যাদি।

"শতেম্" ভাষাসমূহ—সংস্কৃত, অবেস্তা, স্লাভিক ইত্যাদি।

প্রথমটিতে যতগুলি ভাষা আছে উহার মধ্যে একশতবাচক শব্দে 'ক' এই কণ্ঠ্যবর্ণ আছে—দ্বিতীয়টিতে শতবাচক শব্দে 'শ' এই তালব্যবর্ণ আছে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বে মনে করিতেন যে পাশ্চাত্যভাষাগুলি সমস্ত কেণ্টুম্ জাতীয় আর প্রাচ্যভাষাগুলি শতেম জাতীয়। কিন্তু মধ্যএসিয়ার তুখারিয় ভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে এই ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। স্লাভিক ভাষাসমূহেও 'শ' রহিয়াছে—এই শ্রেণীর মধ্যে রুশীয় প্রভৃতি ভাষা পড়ে।

ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষার উপবিভাগগুলির নাম মনে রাখিবার জন্য ইংরাজীতে বেশ একটি সুন্দর সংকেতবাক্য তৈয়ারি করা হইয়াছে The cigar Abstainer. নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

T H e C I G Ar. A B S T Ainer—এস্থলে বড়হাতের অক্ষরের সহিত ছোট অক্ষর থাকিলে একসঙ্গে ধরিতে হইবে।

T = Tokharian—তুখারীয়

He = Hittite—হিটাইট্

C = Celtic—কেল্টিক্

I = Italic—ইতালিক

G = Greek—গ্রীক্

Ar = Armenian—আর্মেনিয়ান্

Ab = Albanian—আলবেনিয়ান্

S = Slavic—স্লাভিক্

T = Teutonic—টিউটনিক্

A = Aryan—আর্য্য

{ in = Indo-Aryan—ইন্দো-আর্য্য
{ er = Eranian.—Aryan = ইরাণী-আর্য্য

শেষের দুই উপবিভাগের শাখা—এই দুইটির সহিত আমরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

(গ) ইন্দো-ইরাণীয় ভাষাসমূহ।

ভারতীয় এবং ইরাণীয় লোকেরা আদিতে নিজেদের আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিত—সংস্কৃত "আর্য্য" শব্দ ও ইরাণীয় "অইর্য্য" শব্দ একই। প্রকৃত পক্ষে এই শাখার নামই "আর্য্য" শাখা। আর্য্য শব্দটি "ইন্দো-ইউরোপীয়" বা "ইন্দো-জার্মাণ" এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, যদিও কয়েকজন পণ্ডিত ইহা এইরূপভাবে ব্যবহার করেন।

পার্শীদের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ "অবেস্তা" এবং হিন্দুদের ঋগ্বেদের ভাষার এত মিল আছে যে মাত্র ধ্বনিতত্ত্বের কতকগুলি সূত্র প্রয়োগ করিলেই উভয়ভাষা রূপান্তরিত হইয়া প্রায় একই আকার ধারণ করে। নিয়ে ইহার উদাহরণ দেওয়া গেল—

অবেস্তা—তেম্ অমবন্তেম্ যজতেম।
হুরেম্ দামোহু সেবিষ্টেম্ মিথ্রেম্
যজৈ জা ও থ্রাব্যো।

বৈদিক—তম্ অমবন্তম্ যজতম্।
সুরম্ ধামসু সবিষ্টম্
মিত্রম্ যজৈ হোত্রাভ্যঃ।

প্রাচীন ইন্দো-ইরাণীয় অবেস্তার ভাষা হইতে মধ্যযুগের পারস্তভাষা এবং আধুনিককালের পারসীভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। তবে আধুনিক পারসীতে আরবী প্রভৃতি ভাষার শব্দ বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রেণী হিসাবে পারসী কিন্তু আরবী হইতে একেবারে বিভিন্ন।

বালুচি, পোষ্তু প্রভৃতি ভাষা ইন্দো-ইরাণীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের খুব অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার চলন আছে। তবে ইন্দো-ইরাণীয় অনেক শব্দ বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ উর্দ্দুভাষায় আরবী, পার্শী প্রভৃতির ছাপ প্রতি পদে রহিয়াছে।

সুতরাং ভারতীয় শাখার—প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলির চর্চ্চা করিতে হইলে ইরাণীয় শাখার জ্ঞান অনেক সাহায্য করে।

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৩৮)

শুভার রক্তাক্ত মুখখানা লইয়া যদি নির্ম্মলা তাহাকে তার মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করিত, তা হইলে বোধ হয় শুভার মা চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা তাহা না করিয়া প্রথমেই তাহাকে কল-তলায় লইয়া গেল। সেখানে সযত্নে তার নাক মুখ, এমন কি সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া বস্ত্র:পরিবর্ত্তন করাইয়া দিল। তার শাশুড়ী তখন মধুঠাকুরের সাহায্য করিতে ঠাকুর ঘরে ছিল। অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা শুভাকে তার মায়ের ঘরে লইয়া শয্যায় শয়ন করাইল। বলিয়া দিল তার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কিছুতেই যেন সে শয্যাত্যাগ না করে। তারপর নালুকে ডাক্তার আনিতে উপদেশ দিয়া ঠাকুরঘরে শাশুড়ীর সহিত দেখা করিতে চলিয়া গেল। নাক মুখ ধোয়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তপড়া একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। তবু ডাক্তারকে শুভার নাকের অবস্থা না দেখাইয়া নির্ম্মলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। নিজের বুদ্ধির দোষে শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হইতে নির্ম্মলার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার বড়ই ভয় হইয়াছে তার অপরাধে ইহারা নিরপরাধ ব্রাহ্মণের উপর পাছে কটূক্তি প্রয়োগ করে।

নালুকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া নির্ম্মলা 'মা'য়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। শুভার মা ঠাকুরসেবাকার্য্যে মধুর সাহায্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, সে কৌতূহলী হইয়া তাহার মুখ হইতে রাখুর রাত্রিবাস কাহিনী শুনিতেছিল।

নির্ম্মলা যখন সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও মধুসূদনের

কাহিনী বলা শেষ হয় নাই। অন্যসময় হইলে মধুকে সে তিরস্কার করিত, কেননা ওই প্রগল্ভতা দোষের জন্যই নির্ম্মলা তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

এই তিরস্কারের ভিতর দিয়া নির্ম্মলা তাহার বুদ্ধিহীনা শাশুড়ীকেও দুইকথা সে শুনাইতে ছাড়িত না। শুভার মা তাহার প্রায়ই সমবয়সী। ঠাকুরঘরে বসিয়া বামুনের সঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া তার গল্পকরা নির্ম্মলার বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল। তথাপি সে কোনও কিছু না বলিয়া কেবল ডাকিল—'মা'।

ঘরের ভিতর পুঁটি ছিল, মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিতেই সে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। শুভার মা শশব্যস্তার মত দাঁড়াইল, আর মধুঠাকুর বড়্‌বড়্‌ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল।

পুঁটিকে কোলে তুলিয়া নির্ম্মলা আবার ডাকিল—"মা"

শুভার মা একাগুই অপ্রতিভের মত বাহিরে আসিয়াই বলিয়া উঠিল—"ব্রজেন্দ্র ও বামুনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনে প্রথমটা আমার মনে সত্যি সত্যিই কষ্ট হয়েছিল বৌমা, কিন্তু মধুর মুখে শুনে বুঝলুম' ছেলে আমার ভালই করেছে। ওর অশেষ গুণ, মদ পর্য্যন্ত খাওয়া আছে। বাসায় যখন আসে, তখনও পর্য্যন্ত তার মুখ থেকে ভর্‌ভর্‌করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ওরকম লোককে গেরস্ত-বাড়ীর চৌকাটে মাথা পর্য্যন্ত গলাতে দেওয়া উচিত নয়।" এসব কথার কোনও উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা বলিল—"পূজোর সাজগোছ সব হয়ে গেছে!"

শুভার মা বলিল—"শুধু নৈবিদ্যিটে সাজিয়ে দিলেই হয়।"

"সে ওই বামুনকেই ক'রে নিতে বল। ব'লে আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"তোমার ঘরে।"

নির্ম্মলার কথার ভাবটা ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া শুভার মা একটু যেন ভীতার মত বলিয়া উঠিল—"কেন বল দেখি!"

"তোমার মেয়ে আজ মরতে মরতে বেঁচে গেছে।"

"বলকি!"

"দেখবে এস।"

ব্যাকুলার মত শুভার মা নির্ম্মলার অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে একবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বুঝতে পারছিনা যে বৌমা!"

"সেই মাতাল বামুন ঘুষী মেরে তার নাক ভেঙে দিয়েছে।"

হাসিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"তামাসা।"

"না মা, তামাসা নয়। তবে মনে হচ্ছে বিশেষ অনিষ্ট হয় নি। বোধ-হয় এখনো আমাদের পুণ্য আছে।"

"সত্যি ঘুসী মেরেছে?"

"সত্যিই মেরেছে মা! তবে মারবো বলে মারেনি। মাতাল মানুষ—নেশায় হাত ছুঁড়েছে। তোমার মেয়ের নাক তার কাছে ছিল—লেগে গেছে।"

আর কোনও কথা না বলিয়া শুভার মা মেয়েকে দেখিতে নির্ম্মলার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল। সত্যসত্যই সে দেখিল কন্যা আহত হইয়াছে, তাহার নাক ফুলিয়াছে। তখন সে শয্যাশায়িনী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ রকমটা কি ক'রে হল শুভা?"

শুভা উত্তর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে নির্ম্মলা বলিল—"এই ত তোমাকে বললুম মা, রাখু ঠাকুর ঘুসী মেরেছে। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হ'লনা।"

"আমাকে মারেনি ত বউদি!"

"মারে নি?"

শুভা চোখমুদিয়া উত্তর করিল—"না।"

শুভার মা বলিল—"তবে কি ক'রে নাকের মাথা খেয়ে এলে?"

শুভা পাসফিরিয়া চোখুমুদিয়া পড়িয়া রহিল। নির্ম্মলা সমস্ত ইতিহাস বলিবার জন্য হাসিমুখে শাশুড়ীকে বাহিরে চলিতে ইঙ্গিত করিল।

সমস্ত ইতিহাস শুনাইয়া যখন নির্ম্মলা চারুর পত্রখানি শাশুড়ীর সম্মুখে পাঠ করিল, তখন শুভার মা'র চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে।

চিঠিপড়া শেষ করিয়া নির্ম্মলা শাশুড়ীর করুণা-সিক্ত মুখেরপানে চাহিয়া বলিল—"মা! প্রায়শ্চিত্তের কি আমাদের উপায় আছে!"

"তোমার কথা বুঝতে পেরেছি।"

"গরীব বামুন কি সাধ করে মাতাল হয়েছে মা?" "কি, করতে, চাও; বল।"

"আমার পুটি যদি আর বছর চারেকেরও বড় হত, তা হলে ওই সাধুকে আমি দান করতুম। দিয়ে বুঝতুম কন্যাকে আমার কখন সোয়ামীর ব্যবহারে চোখের জল ফেলতে হবে না।"

"এ কথা তোমার বলতে অধিকার আছে বৌমা!"

"মা! তোমার মেয়েকে একবার আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, তার সোয়ামী যেন মুখ্যু হয়। মূর্খ স্বামীর অপমান মূর্খ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় পণ্ডিত চরিত্রহীন হ'লে প্রবোধ দেবার যে কিছু থাকে না মা!"

"একটি কথাও মিথ্যা বলনি মা!" বলিয়া শুভার মা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিল। তারপর বলিল—"ওকে মেয়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি থাকিত না, যখন জানতে পারলুম ঠাকুর আমাদের ঘর। কিন্তু ওর যে কিছুই নেই মা। অবশ্য ছেলে আমার বেঁচে থাক্। সে বেঁচে থাকলে, মেয়ের আমার কষ্ট দেখতে পারবে না।"

"সে ভাবনা কাউকেও ভাবতে হবে না মা—বিধাতা আগে থেকেই তা ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছেন। আগে হ'তেই তোমার মেয়ের জন্য আমার হাতে পোনেরো হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অতি বিস্ময়ে শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম ?';

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আর বিধাতা যদি পূর্ণ কৃপা করেন, তা হ'লে বোধ হয় আরও একলাখ্ অবশ্য বাড়ীঘর, গহনা আসবাব নিয়ে। তা হ'লেও কি তোমার মেয়েকে ভাতের ভাবনা ভাবতে হবে মা ?"

মুখ অল্প অবনত করিয়া শুভার মা বলিল—"বুঝতে পারছি আবার নাও পারছি।"

"সে কালামুখী আত্মহত্যা করেছে।"

"না ?"

"তোমার ছেলে ফিরে এলেই সব ঠিক জানতে পারব।"

ঠিক এই সময়ে নালু আসিয়া ডাক্তার-আসার খবর দিল।

ডাক্তার যখন শুভার নাসিকা পরীক্ষা করিয়া আঘাত সম্বন্ধে সকলকে নির্ভয় হইতে বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। তখন নির্ম্মলা খাশুড়ীকে বলিল—"মা! ব্রাহ্মণকে যেতে দিই নি। তুমি ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা ক'রেই, ফিরে এস। তোমার ছেলে কখন আসবে তার ঠিক নেই। ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা আমাদেরই করতে হবে।"

(৩৭)

সারাদিনের মধ্যে রাখুর আর ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় রহিল না। প্রথমটা সে বুদ্ধিহারার মত, নালুবাবুর দ্বারা যেন চালিত হইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সে কাহাকে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই যেন স্থির করিতে না পারিয়া চলিতে হয় তাই চলিল, বসিতে হয় তাই বসিল

যে ঘরে নালু তাহাকে বসাইল, সেটা বাহিরের দরজা বন্ধ করিলে অন্দর হয়, ভিতরের দরজা বন্ধ করিলে হয় সদরের একাংশ।

সেখানে বসিয়া শুভার মায়ের মুখ হইতে সহসা ফুটিয়া ওঠা একটা ক্রন্দন-শব্দ শুনিবার নিশ্চয়তায় সে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। রোদন ত শুনিলই না, সে-ঘরে বসিয়া ভিতর-বাড়ী হইতে মেয়েদের দুই একটা কথাবার্ত্তা শুনিবারও যে সম্ভাবনা ছিল, তাহাও সে শুনিতে পাইল না। বৃষ্টির শব্দও মধ্যে মধ্যে বায়ুর হুঙ্কার—এ দু'টা না থাকিলে সে বেশ বলিতে পারিত এ বাড়ীতে লোক নাই।

নালু তাহাকে বসাইয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং থাকিবার মধ্যে এখন সেখানে আছে কেবল সে। কিন্তু কোথায় আছে, এ কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বোধ হয় উত্তর দিতে পারিত না।

বাড়ীর নিস্তব্ধতা তাহার সমস্ত অন্তর-বাহিরের কথাগুলাকে বুঝি চির-কালেরই মত নিস্তব্ধ করিয়া দিত, যদি না একটা স্বপ্নেরও অপ্রত্যাশিত-মধুর কথা তার নতচক্ষুকে এক শান্ত-সুন্দর মুখের দিকে তুলিয়া ধরিত।

"তামাক খান।"

রাখু দেখিল, নির্ম্মলা একটা হুঁকা হাতে কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

"এ কি—আপনি?"

"নালুকে একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। সরি বাজার গেছে, বাইরের ঝি চাকর আসেনি—"

নির্ম্মলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই রাখু ঈষৎ চঞ্চলভাবেই তার হাত হইতে হুঁকা লইল—লইয়া পার্শ্বস্থ দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিল মুখের কাছে লইতে তাহার হাত আসিল না।

"কোন সঙ্কোচ করবেন না—খান।"

রাখুর মস্তক আবার নত হইল।

ইহাতে নির্ম্মলা যাই বুঝুক, সে বলিল—"আপনি কি কারও হুঁকোয় তামাক খান না?"

"আপনার সুমুখে—"

"দোষ কি?"

তবু রাখু হুঁকা মুখের কাছে লইতে পারিল না, লইতে গিয়া, কলিকায় ফুঁ দেওয়া চারুর মূর্ত্তি-স্মৃতি প্রবল উজ্জ্বলতায় তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। অমনি হুঁকা মুখের কাছে আসিতে আসিতে মধ্যপথে দাঁড়াইয়া গেল।

"তবে আপনি বসুন, আমি ফিরে আসছি। দেখবেন অসাক্ষাতে যেন চ'লে যাবেন না। আপনার এখানে আহারের কথা সকালে যে বলেছিলুম, সেটাকি আপনার মনে ছিল না?"

"ছিল।"

"তবে? কাউকে কিছু না ব'লে চলে যাচ্ছিলেন কেন?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমি মনে করলুম, মধু ঠাকুরকে ঠাকুরপূজা করতে দেখে আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। বাড়ীতে এমন কাউকেও দেখতে পেলুম না, যাকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠাই। কাজেই শুভাকে দিয়েই আপনাকে ধ'রে আনতে পাঠিয়েছিলুম।"

"রাগ কি জন্য হবে বৌমা!"

"আপনি কি আর ফিরে আস্‌তেন?"

রাখু উত্তর দিল না।

"ভাবে বোধ হচ্ছে, আপনি আস্‌তেন না।"

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে রাখু উত্তর করিল—না।"

"তাই বুঝতে পেরেই আপনাকে ধরতে পাঠিয়েছিলুম। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন আপনি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন এটা মনে করতে আমার অপরাধ নেই।"

"আমি দেশে যাচ্ছিলুম।"

"কোথায় কিছুই নেই, হঠাৎ দেশে যাবার জন্য আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? শুনেছি, অনেককাল থেকে ত আপনার সংসার নেই।"

রাখু আবার নিরুত্তর।

এই সময়ে নির্ম্মলা অনেকগুলা প্রশ্ন পরপর করিয়া লইল। রাখু কেমন করিয়া যাইত হাঁটাপথে, না রেলে? যদি হাঁটাপথেই তার যাবার ইচ্ছা থাকিত, তা হলেই বা সেখানে দু'টি আহার করিয়া যাইতে তার দোষ কি ছিল! রেলপথ হইলেও নির্ম্মলা জানিল, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে হাওড়া হইতে তার গন্তব্য ষ্টেশনে যাইবার গাড়ী নাই।

দুইচারিটা প্রশ্নের পর একটি রহস্য করিবার অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রের আহারটা কি বড়ই গুরুতর রকমের হইয়াছিল?"

"ওর জন্যই চলে যাচ্ছলুম বৌমা!"

"পেটভ'রে খাবার জন্যে?" বলিয়া নির্ম্মলা অতি মৃদুহাসির ইঙ্গিতে রাখুকে যেন বিশেষ রকমে অপ্রতিভ করিয়া দিল। "আপনি তামাক খান। তার কাছে যা খেয়েছেন, তাতে যদি আপনার সপ্তাহ ক্ষিধে না থাকে, তবু আপনাকে না খাইয়ে আমি ছেড়েদিচ্ছি না!"

এই সময়ে ঠাকুরঘরে ভোগনিবেদনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শুনিয়া রাখু বলিল—"তা হ'লে যত শীঘ্র পারেন, ঠাকুরের প্রসাদ আমাকে আনাইয়া দিন।"

"ঠাকুরের অদৃষ্টে ত আজ কেবল ভাতেভাত।"

"আমার তাই যথেষ্ট হবে।"

"আপনাকে কি আজ যেতেই হবে। এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের দিনে?"

"যেতে হবে বৌমা!"

"কিন্তু আমি যে মনে করছি, আপনাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।"

"আমি যে বাসাছেড়ে চলে এসেছি!"

"এইখানে থাকবেন।"

ঠিক এমনি সময়ে নালু ভিতর হইতে ডাকিল—"মা!"

"তামাক খান" বলিয়া নির্ম্মলা ভিতরদিকে চলিয়া গেল। রাখুর আর শুভার সংবাদ জানিবার সময় হইল না।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু বার দুই হুঁকায় টান দিয়া দেয়ালে ঠেসিয়া বসিল। তার পর দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া অনর্থক পুঞ্জে পুঞ্জে আগত অশ্রুগুলাকে অঙ্গুলি দিয়া অপসারিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া এই একটু পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কতকগুলা স্নেহের কোমল স্পর্শ তার চির দুঃখ-নিষ্পীড়িত অসাড় হৃদয়ে কতকগুলা মধুর স্পন্দন ঢালিয়া দিয়াছে। সে গুলা গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিকে স্নিগ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু চক্ষু দুটাকে লোকের কাছে অপদস্থ করিবার জন্য বড় অন্যায় রকমেরই তারা উৎপীড়ন করিতেছিল। শুভার নাসিকা মধ্য পথে পড়িয়া যদি না এই মধুর স্পন্দনের মধ্য দেশটা ভাঙ্গিয়া দিত, তা হইলে বোধ হয় তার রোদনের নিবৃত্তি হইত না।

রাখু চোক বুজিয়াই ভগবানের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করিল—হে ঠাকুর, শুভাকে নিরাপদ করিয়া আমার এই সুখ-স্বপ্নের ভাঙা প্রবাহকে আবার তোমার করুণার হাত দিয়া জুড়িয়া দাও।

আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই রাখুর স্নেহ বিড়ম্বিত মন তার সারা-অতীতের ইতিহাস কথা ব্যাকুল ভাবে ধরিতে গেলে একটাকেও সুবিধামত ধরিতে না পারিয়া, তাহার চক্ষুপলককে নিস্পন্দ করিয়া, মাথাটা তার হাঁটুর উপর টানিয়া ঘন ঘুমে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রায় এক ঘণ্টা সে ঘুমাইয়াছে, এমন সময় সে কার যেন কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিল।

চোখ মেলিতেই রাখু দেখিল, জলখাবার মেঝেতে সাজাইয়া আসন পাতিয়া শুভা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সে শশব্যস্তের মত উঠিয়া বসিল। দেখিল, তার নাকে একটা পটি।

"তাই ত শুভাদিদি, কেমন ক'রে আমি তোমার নাকে আঘাত কর লুম ?"

শুভা কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

ভিতর হইতে আবার কথা আসিল—"মুখ চোক ধুয়ে ওঁকে জল খেতে বল্।"

রাখু বুঝিতে পারিল ভিতর হইতে কে কথা কহিতেছে। সে বলিল—"জল-খাবার কেন মা, একবারে ভাত দিলেই ত হইত।"

শুভার মা এইবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ভাত হ'তে কিছু বিলম্ব হবে বাবা। বাজার বসে নি, সরি বাজারে গিয়ে কিছু পায় নি। যদি কিছু মাছ পাওয়া যায়, তাই অন্ত বাজারে লোক পাঠিয়েছি।"

"ঠাকুরের প্রসাদ—ভাতে ভাত দিলেইত হ'ত।"

"কোনও কিছু না পেলে, কাজেই আপনাকে তাই খেতে হবে। আজ আপনাকে নিমন্ত্রণ করে বৌমা বড়ই অপ্রস্তুত হয়েছে।"

"অপ্রস্তুত হবার ত কিছুই দেখছি না। এই যা সাজিয়ে দিয়েছেন, এই সমস্ত খেলে আজ ত আর খাবার প্রয়োজনই হবে না।"

শুভা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। তার পট দেওয়া নাক লইয়া প্রথমে সে রাখুর কাছে আসিতেই চাহে নাই। শুধু বউদিদির তাড়নায় আসিয়াছে। তবু একা আসিতে পারে নাই, মাকে সঙ্গে আসিতে হইয়াছে। এইবারে

সে নাকের কথা ভুলিয়া গেল। ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—"তা বলে আপনি কিছু রাখতে পারবেন না, বউদিদি বলে দিয়েছে আপনাকে সব খেতে হবে।"

তাহার কথাগুলা যে কিঞ্চিৎ অনুনাসিক হইয়াছিল, সেটাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কথা কহিতেই তার মা বলিয়া উঠিল—"আর পেতনীর মত কথা কইতে হবে না ঘর থেকে পান নিয়ে আয়। আর সরিকে বল্, সে একছিলিম তামাক সেজে দিক্।" শুভা পলাইল।

তাহাদের যেন সব গড়াপেটা ছিল। মুখ চোক ধুইয়া যেই রাখু জলযোগ করিতে আসনে বসিল, অমনি সরি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ঠাকুর মা, আমি এখানে থাকছি, আপনি একবার ভিতরে যান—মা কিজন্য আপনাকে ডাকছেন। তার একহাতে পানের ডিবা অন্য হাতে কলিকা।

"তবে তুই কাছে থাক্" বলিয়া শুভার মাও চলিয়া গেল।

এখন সে ঘরে রহিল কেবল রাখু ও সরি। রাখু জলযোগে প্রবৃত্ত হইল, আর সরি পানের ডিবা আসনের কাছে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁদিতে লাগিল। গোটা দুইচার মিষ্টান্ন রাখু মুখে তুলিতেই সে বলিয়া উঠিল—"ঠাকুরমার বড়ই ভাবনা হয়েছে, পাছে মেয়েটির নাক থাঁদা হয়ে যায়।"

খাওয়া বন্ধ করিয়া রাখু মুখ তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"সেরূপ কোন সম্ভাবনা হয়েছে নাকি?"

"ডাক্তারত বলে গেছে নাকের একটা কচিহাড় ভেঙে গেছে। যদি জোড়া না লাগে তা হ'লে অমন বাঁশীর মত সরল নাকটি আর থাকবে না।"

রাখু খাওয়া বন্ধ করিয়া শুধু পাত্রে হাত রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিল। তার সে অবস্থা দেখিয়া সরি হাসি টিপিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর আবার বলিতে লাগিল—"একে ত মেয়ের ওইরূপ—"

"কেন সরো, আমি ত শুভাদিদিকে খুব সুন্দর দেখি।"

"আপনি দেখলে কি হবে, যারা বিয়ে করতে যায় তারাত দেখে না। বাবু ওর পাত্তর খুঁজতে খুঁজতে হায়রাণ হয়ে গেলেন। অমনি অমনিই পাত্তর মিলছে না, দেখবার মত ঐ নাকটী মাত্র ছিল তাও গেলে কি আর মিলবে!"

রাখু আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

"ওকি করলেন ঠাকুর মশাই!"

একথার কোনও উত্তর না দিয়া রাখু হাত মুখ ধুইয়া পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া-

ছিল, সেইখানে বসিল। বলিল—"তাইত সয়ো, এদের ত' তাহ'লে বড়ই বিপদে ফেলে দিলুম।"

"আপনি খাওয়া ছেড়ে উঠবেন জানলে একথাত বলতুম না ঠাকুর মশাই।"

"বলে তুমি ভাল করেছ ঝি, এরা যে কত মহৎ তুমি একথা না বললে আমি বুঝতে পারতুম না। তুমি যদি বৌমাকে একবার ডেকে দাও, তা হ'লে বড় ভাল হয়।"

"তাই ত, মা'র কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব ঠাকুর?"

"কেন, তোমার ত কোনও অপরাধ নেই ঝি! একথা না বললে বরং তুমি অন্যায় করতে। বৌমাকে একবার ডেকে দাও। তাঁর সঙ্গে কথা ক'বার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।" অগত্যা রাখুকে তামাক দিয়া সরি সে স্থান পরিত্যাগ করিল। ক্রমশঃ।

সুদূরের ডাক।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

১

গুরু গম্ভীর মৃদু মৃদঙ্গ
মরম হর্ম্মে বাজেরে,
প্রলয় লহরী এলো যে পুরীর
মাঝারে!
আজিকে সহসা এমন করিল বলো কে,
তাল কেটে যায় প্রমোদ নৃত্যে পলকে,
মলয় অনিলে কেন কালানল ঝলকে
ধূলোটের সুর বেজে উঠে সব কাজে রে।

২

প্রাণমন কাড়া পরিচিত সাড়া
গৃহ হারা কাছে এলোরে,
বলে দিন তোর গেল ফুরাইয়া
গেলরে।

জড়তার ঠাট বিলাসের হাট সাজানো,
প্রেমের পুরীতে সাধের সারঙ বাজানো,
রূপের পেয়ালা অলসলালস মজানো
দূরে ফেল, আঁখি মেলোরে।

৩

কোন সুদূরের বারতা বহিয়া
আসিল এ দূত পুরীতে,
কণক দেউলে কস্ ধরাইল
ত্বরিতে।
আজি মৃদঙ্গ কি ভোলা কাহিনী আলাপে
থর কণ্টক জেগে উঠে ফোটা গোলাপে,
'কদলী পতন' ছেড়ে 'মীননাথ' পলাবে
মধুকরে হবে উড়িতে।

৪

ভাঙ্গার বেদনা হারাণোর ব্যথা
ভুলানো কি কথা স্মরালে।
খুলি রাজসাজ গৈরিক আজ
পরালে।
আজি কারে মনে পড়েছেরে মনে পড়েছে
নাহি কটাক্ষ জলেতে নয়ন ভরেছে,
সকল ভুলায়ে হৃদয় উদাস করেছে
মানস ডেকেছে মরালে।

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগ।

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতীয় জীবনে এক মহাসন্ধিক্ষণ আসিছিল। দেশময় খৃষ্টান মিশনারিগণের দীক্ষামন্ত্রে লোকে মহাসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তড়িৎ ও বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন, ছাপাখানার সুলভ প্রচার, পাশ্চাত্য মহাদেশের নানাপ্রকার প্রমোদবিলাস এদেশের লোকের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন

আনিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসপাঠে লোকে স্বাধীন রাষ্ট্রের উচ্চভাব ও কল্পনাটী ক্রমে আয়ত্ব করিতে শিখিল। যুগধর্ম্মের ধ্বজাবাহক রামগোপাল ঘোষ ও হিন্দু পেট্রিয়টের তেজস্বী সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই ভাব-প্রচারে অগ্রণী হইলেন। শিশু বাঙ্গলা সাহিত্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের সাহায্যে তারুণ্যে মণ্ডিতশ্রী হইয়া উঠিল। কিছু পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উদ্দেশে বেদান্তের একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রবল বাসনাটা দেশবাসীর মনে অনেকটা সংযত করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক মিলন সাধনে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সাফল্যের কয়েক বৎসর পরে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে তাঁহার সহযোগী নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিপালন করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মসংঘর্ষের এই বিপুল আন্দোলনে বাঙ্গলা নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি। খ্রীষ্টান পাদরিগণের লিখিত অষ্টাদশ শতাব্দীর কতকগুলি বাঙ্গলা রচনায় এই নাট্য সাহিত্যের প্রথম বিকাশ দেখা যায়। কেশব চন্দ্র নিজেও একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ছিলেন। *

এই শতাব্দীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ "তত্ত্ববোধিনী সভা" স্থাপন ও ইহার মুখ পত্র স্বরূপ একটী মাসিকপত্র প্রকাশ করিলেন। কিশোরিচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি—পরিসেবিত Citizen নামে আর একখানি সাময়িক পত্র বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের সমালোচনা করিয়া নাট্যকলার সম্যক উন্নতি করিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাময়িকের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রবর্ত্তিত "সর্ব্ব শুভকরী" (১৮৫০), সুধী

---

* সারথী, শ্রাবণ, ১৩২৭, ৭৮ পৃঃ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির সহিত পনেরো ষোল বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র তাঁহার জন্মস্থান গৌরীভা গ্রামে হাম্‌লেটের অভিনয় করেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কৃত অধুনা দুষ্প্রাপ্য, 'নববৃন্দাবন' নামক সুবিখ্যাত নাটকে কেশবচন্দ্র পাহাড়ী বাবা ও যোগীর অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নাটকে উন্মাদিনীর দৃশ্যটী তাঁহারই রচিত ও ঋত্বিকের ভূমিকাটী নরেন্দ্রনাথ—পরে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করিতেন। এই আধ্যাত্মিক নাটকটী আলবার্ট হল, কমলকুটীর, মহারাজা স্যর যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রমানাথ ঘোষ ও রংপুর কাকিনার মহারাজার প্রাসাদে অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকের মূল আধ্যাত্মিক ভাবটী বুঝিতে হইলে কেশবচন্দ্র রচিত "দৈনিক প্রার্থনা"র অংশবিশেষ পড়া প্রয়োজন। সুকুমার কলা, যাত্রা-গান ও সেক্‌সপীয়রের নাটকের কেশবচন্দ্র পরম ভক্ত ছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থসংগ্রহ", রেভা কৃষ্ণবন্দ্যো সম্পাদিত বিদ্যাকল্পদ্রুম ও হিন্দু কলেজের ছাত্র পেয়ারী চাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার প্রতিষ্ঠিত ও সরল ভাষায় লিখিত "মাসিক পত্রিকা" (১৮৫৪) নাট্য গ্রন্থের ও অভিনয়ের ধারাবাহিক সমালোচনা করিয়া এই সুকুমার কলাসাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি করিয়াছে। আবার অনেকগুলি বাঙ্গালা সাময়িকের চেষ্টা ছিল—সমাজের ত্রুটী ব্যঙ্গচ্ছলে দেখাইয়া দিয়া সেগুলির সংশোধন করা। উৎকৃষ্টতম বাঙ্গালা নাটক তখন না লেখা হইলেও নাটকাভিনয় দর্শনের জন্য তখন সকলের মনে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে। ক্ষণিক সাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠা গুলি খুঁজিলে এই সময়কার একটী চিত্র পাওয়া যায়। ক্রমে লোকের মনে যাত্রা গান শুনিবার আগ্রহ ঘুচিয়া গেল। "বিল্বমঙ্গল" ও "ভদ্রার্জ্জুন" নাটক প্রথমে সমধিক সমাদর লাভ করিল। *

গত শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বৎসর নাটকাভিনয়ের ইতিহাস নানা দুর্য্যোগে পরিপূর্ণ। প্রথম ও প্রধানতম অন্তরায় ছিল নারীর ভূমিকা গ্রহণে। সামাজিক ব্যবস্থা, যুগগত কুসংস্কার ও হিন্দুমুসলমান রমণীগণের পর্দ্দানশিনত্ব এই ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল। পণ্ডিতগণের অমোঘ শাসনবজ্র ও সাহিত্যদর্পণকারের বিধানাবলী যত্র তত্র বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের বিরুদ্ধ ছিল। সেক্স্পীয়রের ট্র্যাজিডির মত কোন ও ট্র্যাজিডির বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা তখন সম্ভবপর ছিল না। চুম্বন, জৃম্ভন, আলিঙ্গন, বা অন্য কোনও প্রকার বীভৎসভাব প্রকাশের অবকাশ সংস্কৃত রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইত না। নাটকের যেখানে এই সমস্ত ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইত, সেখানে সেগুলি নাটকীয় উক্তির মধ্যে অভিব্যক্ত হইত কিংবা সমগ্র নাটকীয় ক্রিয়াকলাপগুলি একটী ক্ষুদ্র দৃশ্যে নিবদ্ধ হইত। নাট্য সূত্রানুসারে এই দৃশ্য সমূহের নাম 'বিষ্কম্ভক।' *

এই সমস্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা নাট্যকারগণ পূর্ব্ব পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপরন্ত 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি নাটক কোনও হিন্দুগৃহে অভিনীত হইতে পারিত না, কারণ ইহাতে শিব সতীর অমর্য্যাদাসূচক দৃশ্যাবলী আছে ও মহা নৃত্যের প্রলয়ঙ্কর বিবরণ আছে। নাটকের গঠন প্রণালী

---

* রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "রত্নাবলী"র ভূমিকা।

* "বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাং শানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষেপার্থস্তু বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্র প্রযোজিতঃ॥"—দশরূপকম্।

(Technique) লইয়াই সংস্কৃত পণ্ডিতগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল। যাত্রাভিনয়ের ঠাট বজায় থাকিলেও এ যুগের কয়েক খানি শ্রেষ্ঠ নাটক সংস্কৃত সূত্রের বিরুদ্ধে লিখিত। পাশ্চাত্য নাট্যকলার কৌশল ও অভিব্যক্তি বাঙ্গলা নাটকের মধ্যে প্রথমে অতি ক্ষীণভাবেই অনুস্যূত হইতেছিল। কিন্তু তদানীন্তন পণ্ডিতগণ নব্য আদর্শকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছিলেন। বাঙ্গালা নাটকের দ্রুত উন্নতির পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায় ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইব যে নাট্য সহিত্যের এই উষাকালে কয়েকজন সুধী পাশ্চাত্য অভিনেতাও বাঙ্গালীর সঙ্গে এক যোগে কার্য্য করিয়া জয় সাফল্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল মাত্র কারবারের খাতিরে রঙ্গমঞ্চ চালাইবার ধৃষ্টতা এমন অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে না বলিয়াই বাঙ্গালা নাট্যকলার আদি উৎসাহিগণ ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাঙ্গালায় সখের দল প্রবর্ত্তিত করিলেন। এ বিষয়ে দেশের বড় বড় রাজামহারাজা ও জমীদারগণ প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেন দেখিয়া তাঁহাদের অন্নজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহাদেরই অর্থানুকুল্যে এই নাট্যকলার প্রচার হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে এই সমস্ত অভিনয়ের সময় নানা জাতীয় লোকসমাগম হইত। অভিনয় সাফল্য হইলে অনেকের বিরুদ্ধ মত খণ্ডিত হইত, অনেক অনুকূল সমালোচনা ও আন্দোলন হইত। বাঙ্গালার জাতীয় রঙ্গমঞ্চগঠনের প্রথম যুগে নাট্যকারগণ এই সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটাইয়া কেমন করিয়া পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া তুলিলেন এইবার তাহার আলোচনা করিব।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর ভবনে, প্রথম 'এমেচার' বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনীত হয়। দর্শক ও অভিনেতৃগণ দৃশ্য পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানও পরিবর্ত্তন করিত এবং প্রতি দৃশ্যের প্রারম্ভে ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে প্রস্তাবনা আবৃত্তি হইত। এই সময়ে হিন্দু কলেজের ইংরাজীর খ্যাতনামা অধ্যাপক কাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ড্‌সন ও অবসর প্রাপ্ত ব্যারিষ্টার ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অধ্যাপক হারমান্ জাফ্রয় নিজ নিজ ছাত্রগণকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী নাটক হইতে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের এই সাহিত্যানুরাগ ছাত্রগণকে নানাপ্রকার অভিনয়কুশলী করিয়া তুলিয়াছিল। এই ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে একজন পরে বেলগাছিয়া থিয়েটার ভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটকের

অভাবে ইংরাজী নাটক সমূহ কলিকাতাস্থ জমীদারগণের ভবনে মহাসমারোহে অভিনীত হইত। কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ার বাগান-বাড়ীতে ইংরাজী অনুবাদে ভবভূতির "উত্তর রামচরিত" অভিনীত হয়, ইহাতে উইলসন্ সাহেব নিজে নাটকের পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরে ডেভিড হেয়ার একাডেমীতে সেক্‌স্‌পীয়র রচিত "মার্চেন্ট অফ ভিনিস্" ও "জুলিয়াস্ সিজারে"র অভিনয় হয়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারের পূর্ব্বতন ছাত্রেরা প্রথমে "টাউন্ থিয়েটার" স্থাপন করিয়া পরে এই বিদ্যালয়েই "ওরিয়েন্টাল্ থিয়েটার" নামে তাঁহারা আর একটী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান যেখানে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ প্রতিষ্ঠিত (৩০, পার্ক ষ্ট্রীট), ঐখানে তখন যে সাঁ সুচি Sans Souci theatre) থিয়েটার ছিল সেখানকার মিঃ ক্লিঙ্গার নামক এক-জন অভিনেতা এই নবস্থাপিত ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের নাটক পরিচালক হইলেন। এইখানে সেক্‌স্‌পীয়রের "ওথেলো", "মার্চেন্ট অফ ভিনিস্" ও চতুর্থ "হেনরির" প্রথমাংশ (যাহাতে ফলষ্টাফের কৌতুকময় দৃশ্য আছে) অভিনীত হয়। গ্রেগ্ (Mrs. Greig) নামক একজন সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী এই অভিনয়ে পোর্সিয়ার অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয়ে খুব সুখ্যাতি লাভ করেন। অভিনয় জগতে ইয়োরোপের প্রখ্যাত নামগুলির তুলনায় বাঙ্গালায় এই যুগে কোনও অভিনেতা না থাকিলেও বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য ইংরাজীর সংস্পর্শে আসিয়া যে উন্নত ফললাভ করিয়াছিল, তাহা সব জাতির সাহিত্যে সহজে ঘটে না। ইয়োরোপে ম্যাকরেডি, ফেলপস্, আর্ভিং, টি, রিস্তোরি, হেলেন ফসিট, কেট ও এলেন টেরির নাম সুবিখ্যাত। সারা বার্ণার্ডের নাম না জানে এমন কে আছে? সাঁ সুচি থিয়েটারেও হোরেস হীমান উইলসন, ইংলিশ-ম্যানের সম্পাদক মিঃ ষ্টকুলার, পার্কার, টরেলস্ ও হিউম্ নামে কলিকাতার এক জন মাজিষ্ট্রেট অভিনয় করিতেন!

ইংরাজী থিয়েটারের এই দ্রুত উন্নতির সময় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারে সমাজের অভিনয়সংক্রান্ত অনেক কুসংস্কার সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার হইল, কলিকাতায় ঠাকুর প্রাসাদে ভারত বিখ্যাত অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদের সমাগম হইল এবং অনেক স্থলে সঙ্গীতসভ্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বর্গীয় মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহনঠাকুর নিজ প্রতিভাগুণে সঙ্গীতে ও বাদ্যে বিশ্ব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসঙ্গীত ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের করুণরসাত্মক প্রার্থনাবলী বাঙ্গালা নাটকের পরিপোষণে প্রধান

সহায় হইল। ইহাতে নাটকের কথোপকথনে ভাষা, নাটকীয় চরিত্র চিত্রণ ও সঙ্গীত যোজনের উপায় অনেকটা সংস্কৃত হইয়া উঠিল।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে মিউটিনীর বৎসরে অনেকগুলি নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। "বিদ্যাসুন্দর", "রুক্মিণীহরণ" "মালতী মাধব", "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব," "শকুন্তলা" (ইহা বিডন ষ্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাটীতে অভিনীত হয়), "মহাশ্বেতা" "বেণীসংহার" (যোড়াসাঁকোয় কালীসিংহের বাড়ী অভিনীত), ও "বিক্রমোর্ব্বশী" (কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে অনূদিত) নাটক এই সময় সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই শেষোক্ত নাটকের অভিনয়ে একটী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন ও ভারতগবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী স্যর সিসিল্ বিডন্ ইহার অভিনয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। শিবতলায় (বর্ত্তমান ঠাকুর ক্যাস্‌ল্ ষ্ট্রীট্) রামজয় বসাকের গৃহে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের সর্ব্ব প্রথম অভিনয় হয়। রংপুরের জমীদার ও দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের পরমবন্ধু কালীচরণ চৌধুরী এই নাটক রচনাকল্পে পণ্ডিত রামনারাণে তর্করত্নকে উৎসাহিত করিয়া অর্থ সাহায্য করেন। তিনি "পদ্মিনী উপাখ্যান"-কার 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অর্থ সাহায্য করেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ক্রীত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (পরে, মহারাজা স্যর্) সুরম্য উদ্যানবাটিকায় বিখ্যাত বেলগাছিয়া থিয়েটার স্থাপিত হয়। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিং এই নবীন উদ্যমে যতীন্দ্রমোহনের সহযোগী ছিলেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ন্যায় যতীন্দ্রমোহনও সে যুগে সর্ব্ববিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের উন্নতিসাধন ও বাঙ্গলা নাটকের পরিপুষ্টি বিষয়ে ইঁহারা সকলেই একযোগে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। *

শ্রীহর্ষ-প্রণীত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক "রত্নাবলীর" পণ্ডিত রামনারায়ণ-কৃত বঙ্গানুবাদের অভিনয় সময়ে বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম "কন্সার্ট পার্টি" আরব্ধ হয়।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা জুলাই তারিখে "রত্নাবলী" নাটক "বেলগেছিয়া থিয়েটারে" অভিনীত হয়। উপর্য্যুপরি কয়েক রজনী ধরিয়া একই নাটকের

---

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কৃত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় আছে—Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising National Theatre." তাঁহার "কৃষ্ণকুমারী নাটকে"র উপহার-পত্রও দ্রষ্টব্য।

এরূপ সমারোহে পুনরভিনয় সহজে ঘটে না। ইংরাজ, মুসলমান, বাঙ্গালী, ইহুদী ও মাড়োয়ারি দর্শকের এমন একত্র সম্মিলনও নাট্যের ইতিহাসে বিরল। বঙ্গদেশের ছোটলাট স্যর ফ্রেডেরিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের অনেক জজ ও অন্যান্য বহুপদস্থব্যক্তি এই অভিনয়দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দৃশ্যপট ও বেশভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে যে সমস্ত নজীর পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে রাজভ্রাতৃগণ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য মাইকেল দত্ত "রত্নাবলী" নাটকটী ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'রত্নাবলীর" অভিনয় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। এই অভিনয়ের অপূর্ব্ব সাফল্য হইতে লোকে বুঝিতে পারিল যে বাঙ্গালা নাটকের একটা গৌরবময় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মাইকেলের "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক লিখিত হয়। কবি ইহার ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছিলেন যে নাটকখানি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের বিরুদ্ধপন্থী। অবশ্য ইহাতে পূর্ণমাত্রায় ইংরাজীপ্রভাব বর্ত্তমান ছিল। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ৩রা সেপ্‌টেম্বর যখন ইহা বেলগেছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইল, তখন পণ্ডিতবর্গের আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। *

---

* ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের সমালোচনা করেন—"বিবিধার্থসংগ্রহ," ৫ম পর্ব্ব, ৫৮ সংখ্যা, শক ১৭৮০, মাঘ। মাইকেল এই নাটকের সম্বন্ধে একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama, but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, and the plot interesting, the characters will maintain, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's Poetry, because it is full of orientalism, Byron's Poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides remember that I am writing for that portion of my Countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking*, and that it is my intention to throw of the fetters forged for us by a servile admiration for everything Sanskrit" গৌরদাস বসাককে লিখিত এই পত্রখানি মাইকেল-চরিতকার বসু এবং সোম মহাশয়দ্বয়ের পুস্তকে উদ্ধৃত। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে "শর্ম্মিষ্ঠা"-অভিনয়ে লোকের মতামত সম্বন্ধে মাইকেল দত্ত লিখিয়াছেন,—"When *Carmistha* was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the best romantic spectator was charmed with the character of *Carmistha* and shed tears with her. As for my

এই সময়ে বেলগেছিয়া থিয়েটারে মাইকেলের অন্য কয়েকখানি নাটকও অভিনীত হয়—"পদ্মাবতী", "একেই কি বলে সভ্যতা ?" "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ" ও ",কৃষ্ণকুমারী নাটক"। "পদ্মাবতী" নাটকে একটী গ্রীক পুরাতন কাহিনী হিন্দু প্রতিবেশপ্রভাবের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" বাঙ্গালায় যে প্রহসনের ধারা আরব্ধ করিয়াছিল তাহা বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। নব্যবঙ্গের অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কলুষতা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা লোক-চক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত করিয়া দেওয়াই এই প্রহসনের উদ্দেশ্য। "সধবার একাদশী" ও "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে মাইকেলের আদর্শ সম্যক্ পরিস্ফুট। মাইকেলের প্রহসন-রচনার অনতিকালপূর্ব্বে এই ধরণের কয়েকখানি সামাজিক প্রহসন রচিত হইয়াছিল ও সেগুলি যথেষ্ট খ্যাতিও লাভ করিয়াছিল, যথা—"নববাবু বিলাস," "নববিধি বিলাস,"* "বুঝলে কিনা"? "উভয়সঙ্কট" ইত্যাদি।

শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল্ সোসাইটীতেও "একেই কি বলে সভ্যতা"র অভিনয় হয়। কিন্তু মাইকেলের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আর "পদ্মাবতী নাটকের" অভিনয় হয় নাই। বেঙ্গল এমেচার থিয়েট্রিকাল্ কোম্পানীর দ্বারা বড়তলায় (২৪৬, অপারচিৎপুর রোড্) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয় ও ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের দত্তগণের বাড়ীতে ইহা যাত্রাকারে প্রদর্শিত হয়। "কৃষ্ণকুমারী নাটক" বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম নাটকীয় অমিত্রাক্ষর রচনা। ইহা বিয়োগান্ত বলিয়া রাজমাতার অসম্মতিবশাৎ পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে অভিনীত হয় নাই, কিন্তু শোভাবাজারের দলের দ্বারা ইহা ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে অভিনীত হইয়াছিল।

নাটকাভিনয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালা নাটক রচনার গতিও শ্লথ হইয়া পড়িল। "একেই কি বলে সভ্যতা ?" ও "বুড়ো-

---

own feelings, they were things to dream of not to tell. Poor old Ramchandra (an old tutor of Hindu College) was half mad and grasped my hand saying. "Why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed ! Oh it is beautiful !"

* ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটী সমালোচনায় বলিয়াছেন, "আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই (একেই কি বলে সভ্যতা) সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" এই মত উক্ত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাবিত্রী লাইব্রেরীর একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য।"

শালিকের ঘাড়ে রোঁ।” তদানীন্তন কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ যুবককে লক্ষ্য-করিয়া রচিত হইয়াছিল বলিয়া রাজারা এই দুইটী নাটক বেলগেছিয়া নাট্য-শালায় অভিনয় করিতে সম্মত হন নাই। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা নাটকের অভাব উপলব্ধি করিয়া কয়েকখানি ইংরাজী প্রহসন রচনা করাইয়া সেগুলির অভিনয় করান, যথা Prince for an Hour (Abou Hossain ?), Power and Principle, Fast Train, High Pressure, Express ইত্যাদির ইহাদেরমধ্যে একখানিও মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ঠাকু বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে ২৯শে মার্চ্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা নাটকের উন্নতি সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িল। লোকে তখন বুঝিতে পারিল যে সখের অভিনয়ে নাটকের স্থায়ী উন্নতি সম্ভবপর নয়। কিন্তু তখন লোকের মনে একটা নাটকানুরাগ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাই ক্রমশঃ পেশাদারী থিয়েটারের দল কলিকাতার স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ প্রবন্ধে আমর আর সে ইতিহাসের অনুসরণ করিব না।

“আকামের গোঁসাই”

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

(১)

তার মুখের জন্য তাকে কেউ দেখতে পারতো না। তেমন ঠোঁটকাটা দুনিয়ায় দুটো ছিল না। বয়স, পদ, মানের দিকে দৃক্‌পাত নাই—যখন যা মনে আসত, তখন তাই সবার মুখের সামনে ব'লে দিত। কিন্তু যে স্বভাব ম'লেও যায় না, তা সে কেমন ক'রে হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের অনুরোধে অথবা বাক্যযন্ত্রণাভাগীদের অভিশাপে একবারে বদলে ফেলবে! ভগবান সাপকে কেন বিষ দিলেন! এক বিকার রোগের ওষুধের সময় সে বিষ কাজে লাগে, অন্য সময় সাপের দংশনে মানুষ মরেই যায়। বিধাতা যাকে কোনও গুণ না দেন, তার দোষের মাত্রাটা যেন কিছু বেশীরকম হ'য়ে থাকে। ছেলেটিকে মা ডাকতেন “আকামের গোঁসাই”। পুরুষের আত্মম্ভরিতা, আর নারীর

অভিমান তার চরিত্রে পুরোমাত্রায় ছিল। বাবা বলতেন এত মান-অভিমান নিয়ে যারা থাকে তাদের দ্বারা কাজ হয় না।

(২)

সে মনে করত জীবনে কাজ আবার কি আছে; মশা, মাছিকে ভগবান কোন্ কাজের জন্ম সৃষ্টি করেছিলেন? মশারি বিক্রী হ'বে ব'লে মশার সৃষ্টি হয়েছিল এরূপ ভাবাও যা, অমুক উপকারটা হবে ব'লে একজনের জীবনের সৃষ্টি হয়েছে বলাও তাই।

তাই "আকামের গোঁসাই"—মায়ের দেওয়া নামে খুসীই থাকতো। মায়ের পাঁচটা ছেলে ছিল—কিন্তু আকামের একটিই মা ছিল। অন্য ছেলেরা মায়ের উপযুক্ত ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি রূপে গুণে তাদের সন্তান ব'লে, পরিচয় দিতে মায়ের বুক গরবে ফুলে উঠত। কিন্তু আকামকে নিয়ে মায়ের মুস্কিল হয়েছিল। সংসারে কত রকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে তার মত ওস্তাদ কেউ ছিল না। মার শত তিরস্কারেও তার চৈতন্য হ'ত না। কখনও অভিমানে ভরা বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে মার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকতো—আবার কখনো বা চাইতে চাইতে চোখের পাতা ভিজে আসতো। কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই।

(৩)

"আকাম" একদিন কি মনে ক'রে বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। কাজের মানুষ ছিল না ব'লে তার অভাবটা সংসারে তেমন একটা শূন্যতা এনে দিল না। তবে সে ছিল মানব দেহের প্লীহা যন্ত্রটির মত—কেন আছে ডাক্তাররা বলতে পারেন না—অথচ না থাকলেও প্রাণ বাঁচে না। হাজার হোক মায়ের প্রাণ, ছেলাটা হতভাগা হলেও তার জন্ম মনটা কেমন কেমন করত। পথে পাওয়া সন্তান হ'লেও মা তাকে পেটের ছেলের মত করেই মানুষ করেছিলেন। তাই বাড়ীর অন্য লোকে খুসী হলেও মা একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব প্রথম প্রথম অনুভব না ক'রে পারতেন না।

(৪)

পশ্চিমের একটা সহরে "আকামকে" নিয়ে একটি সুন্দরী যুবতী ভিক্ষা ক'রে বেড়াত। জগতে কেউ যাকে দেখতে পারতো না, শিশুর সরলতা যার যৌবনের অপরাধ হয়েছিল, প্রেমের কোমলতা যাকে পাগল নাম দিয়েছিল, হৃদয়তন্ত্রীর ছিন্ন তারের ঝঙ্কার যার জীবনের গানকে ক্রন্দনের প্রলাপ করেছিল, আর

অন্তরের বিষণ্ণ অন্তর্মুখীনতাকে অলসতার আখ্যা দিয়েছিল—সেই সৃষ্টিছাড়া হতভাগার জীবনসঙ্গিনী হতে সে রমণীর সাধ হয়েছিল। ভগবান এক একজনকে এমনি করেই দুঃখের নেশায় পাগল করেন! চোখ খারাপ না হ'লেও যেমন কেউ কেউ সখ ক'রে চশমা পরে, এই সকল ব্যক্তিও সেইরূপ সাধ ক'রে দুঃখকে বরণ ক'রে নেয় এবং সেই দুঃখের বেদনার মাঝে নিজের জীবনের গভীরতম সুখের উৎস খুঁজে পায়।

৫

টাইফয়েডে "আকামের" চোখ দুটী অন্ধ হ'য়ে গেছে—আর কথা কইবার শক্তি জন্মের মত লোপ পেয়েছে। তার জীবনসঙ্গিনী রোগের সময় শুশ্রূষা করতে করতে আকামের উপর অনুরক্ত হয়। সম্পদের স্নেহক্রোড়ে লালিত পালিত হ'লেও এই যুবতী বাপমায়ের অমতেই ঐ হতভাগ্য যুবকের দুঃখময় জীবন স্রোতে ঝাঁপ দেয়। আজ তার সেই অনুপম প্রেম তাকে পথের ভিখারিণী করেছে।

৬

সংসারে সে-রূপের চেয়ে রূপ অনেকেরই ছিল। কিন্তু প্রাণের সে করুণ মধুর সৌন্দর্য্যের রূপ কোন্ মুখে এমন ক'রে ফুটে উঠেছিল? সেই ডাগর ডাগর চোক, তুলি দিয়ে আঁকা হাঁটু পর্য্যন্ত এলানো ঢেউখেলানো চুল ক্ষীণ দেহ খানিতে সৌন্দর্য্যের চিক্কণতা—মুখখানিতে কি স্বর্গীয় করুণার ম্লান তেজ, যেন রাস্তার লোককে ক্ষণেকের জন্য অমিয় ধারায় স্নান করিয়ে দিত। এত দুঃখ এত কষ্ট, তবুও তার কুন্দ ফুলের মত দাঁতের হাঁসির রেখাঙ্কণে কি সুন্দর ছবি খানিই ফুটে উঠতো।

৭

"আকাম" এখন পক্ষাঘাতে শয্যাগত। কুটীরের মধ্যে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে "আকাম" আজ তার স্বর্গরচনা নিয়ে ব্যস্ত। কেবল দুটি ভিক্ষার জন্য তার অন্ধের নয়নমণি যখন বাহিরে যায়, তখন সে ছটফট করে—এককালে যাহা এত সুন্দর ছিল সেই দৃষ্টিহীন বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে ধারা বয়ে যায়। করুণাময়ী ফিরে এসে কত বকে, কত আদর করে—নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ায়। "আকামে"র আজ একবারেই চোখে দৃষ্টি নাই, মুখে বাক্‌শক্তি নাই, দেহ পক্ষাঘাতে অবসন্ন, মার আশীর্ব্বাদে সে যে আজ সত্য সত্যই আকাম হয়েছে; তার কোনও

কাম নেই—সংসারে মুদিত আঁখিতে সে এক আনন্দমূর্ত্তি দেখে আর গোঁসাই বাবাজীর ভক্ত শিষ্যাটি কেবলই গান করে শোনায়—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা,
নিতুই নূতন পীরিতিরতন
যতনে রাখিল তারা।"
"পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া রেখ,
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ!"

আবার :—"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই, সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহুক তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয়, না, সজনি,
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এদেশে কহিল
লাগিল মরম ব্যথা।"

গৌতম বুদ্ধ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী]

(৭)

বুদ্ধত্বলাভের পর রাজায়তন বৃক্ষ হইতে বুদ্ধদেব অজপালের বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার মনে নানা তর্কবিতর্কের উদয় হইল। তিনি এই নির্জ্জনে চিন্তা করিলেন—"আমি যে সকল সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান পাইয়াছি সেই সকল সাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা কেবল সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র হইবে কিনা? যে সংসারী, তাহার সার বস্তু সংসার; ভোগবিলাসের কোলে যে লালিত পালিত, উপভোগে তাহার কামনার পরিতৃপ্ত হয় না। সত্যালোকের জ্যোতিঃ বা নির্ব্বাণের পথ খুঁজিয়া বাহির করা বড় সহজ ব্যাপার নহে এবং সংসারীর পক্ষে সেই পথে চলা ফেরা করাও নিতান্ত কঠিন। কাজেই এখন আমি যদি এই সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচার করি, আর যদি লোক তাহা না বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, তবে আমার সকল শ্রমই পণ্ড হইবে।" এই ভাবিয়া যখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বতোভদ্র বুদ্ধদেব প্রচারে বিরত হইবেন স্থির করিলেন, তখন স্বয়ংভূ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবযোনিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভূতদয়া ও বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া বলিলেন—"যদি আপনি ধর্ম্মপ্রচার না করেন,—যদি আপনি মুক্তির পথ দেখাইয়া না দেন, তবে এই সমগ্র জীবলোক ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।" দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ চিন্তা করিলেন,—কাহার নিকট তিনি সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের সত্যসমাচার প্রচার করিবেন। সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল। তিনি পূর্ব্ব সঙ্গী অরণ্যবাসের প্রধান সহায় পাঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু পাঁচ জনের অনুসন্ধান করিবার মানসে বারাণসীর সন্নিহিত মৃগদাবে (মিগদায় বা ঋষিপত্তনে—ঈশিপত্তনে বর্ত্তমান সারনাথে) গমন করিলেন। সেইখানে সেই পাঁচজনের সম্মুখেই তিনি প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেন—অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মমত ও উপদেশ প্রচার করিলেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন সকল বিষয়েরই অতিমাত্রা পরিহার করিয়া, মধ্যপথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। একদিকে সংসারের ভোগবিলাসিতার অনুসরণ, অন্যদিকে নিরর্থক

কঠোর তপশ্চর্য্যার অবলম্বন এই উভয় পথই একান্ত পরিহার্য্য। মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই জ্ঞান ও নির্ব্বাণের অধিকারী হইতে পারা যায়। এমন কি, তাহাই একমাত্র পথ, ইহাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিলেন। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধদেব ব্যাধি, ব্যাধির উৎপত্তি ও চিকিৎসা বা নিবৃত্তি এবং কোন পথে চলিলেই বা ব্যাধির চিরকালের মত নিবৃত্তি হয়—এই চারিটী বিষয়ের ব্যাখ্যান প্রদান করেন। এইরূপে নানাভাবে নানাস্থানে নিজের মত প্রচার করিয়া বুদ্ধ নিজের পূর্ব্ব সহচর পঞ্চবর্যীয় ভিক্ষু পাঁচজনকে স্বমতে দীক্ষিত করেন এবং এই পাঁচজনই বৌদ্ধসংঘের প্রথম শিষ্য।

(৮)

এই সময়ে বুদ্ধের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারার্থ মগধদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণেই কাটিয়াছিল। অচিরেই তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যের সংখ্যা পর পর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় লোকেরা আবাসের জন্য তাঁহাকে বড় বড় বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। সমস্ত বর্ষাকালটা তিনি এইরকম কোন এক বিহারে থাকিতেন এবং বর্ষার শেষে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া চারি দিকের লোককে পবিত্র পুণ্যময় জীবনযাপন করিবার উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন। প্রথম প্রথম যাঁহারা দীক্ষিত হইয়া তাঁহার শিষ্য হয়েন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাশ্যপেরা তিন ভাই, জটীল (জটাধারী) ভিক্ষুগণ এবং উরুবিল্বার সাগ্নিক (অগ্নিউপাসকগণ) গণই প্রধান। কতকগুলি অমানুষিক দৈবঘটনার প্রক্রিয়া বলেই তথাগত তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই সকল অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে জলে ভ্রমণ, অগ্নিমন্দিরের সর্পদমন প্রভৃতি কয়েকটার অতি জ্বলন্ত চিত্র সাঞ্চীস্তূপের পূর্ব্বতোরণে অঙ্কিত আছে। ইহার অল্প পরেই বুদ্ধদেব রাজগৃহে আরও কয়েকজন শিষ্যকে দীক্ষা দেন; এবং ইহারই অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। এই শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই দুইজনের অস্থি (দেহাবশেষ) সাঞ্চীর তৃতীয় স্তূপে বিনিহিত আছে।

(৯)

বুদ্ধদেব সেকালের যত প্রধান প্রধান রাজসভায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, সকল জায়গায়ই তিনি আদরের সহিত অভিনন্দিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনাজিৎ এবং মগধাধিপতি বিম্বিসার ও অজাতশত্রু মহা-

সমারোহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এই দুইটী প্রসঙ্গই সাঞ্চীর শিলা-স্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে। এই সময়ে অনেক উদ্যান, আশ্রম ও বিহার নিজ বুদ্ধকে কিংবা তাঁহার আশ্রিত ভিক্ষুসংঘকে দান করা হইয়াছিল। এই সকল দানের মধ্যে জেতবন উদ্যান ও শ্রাবস্তীর বিহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অনাথ পিণ্ডিক নামে কোন ধনীশ্রেষ্ঠী (শেঠ) ইহা দিয়াছিলেন। রাজকুমার জেতের নিকট হইতে উহা বহুসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রায় খরিদ করা হইয়াছিল ;—কথিত আছে, যত সুবর্ণমুদ্রায় ঐ বিহার ও উদ্যানের ভূমিভাগ আবৃত হইতে পারে তত স্বর্ণমুদ্রাই মূল্য স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। অপর অপর দানের মধ্যে আম্রপালী নামে কোন বারাঙ্গণার দেওয়া বৈশালীর আম্রবন এবং বিম্বিসারের দেওয়া রাজগৃহের বেণুবন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব যখন প্রথম রাজগৃহে গমন করেন সেই সময়ে সেই সুপ্রসিদ্ধ বেণুবন নিজ বুদ্ধকেই দেওয়া হইয়াছিল। এই বেণুবন উত্তরকালে বুদ্ধের অতি প্রিয় ও প্রীতিপদ বাসস্থান হইয়াছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার এই স্থানে কিম্বা নিকটবর্ত্তী আরও দুই এক স্থানে অবস্থানের ব্যাপার সংক্রান্ত অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজগৃহে অবস্থানকালেই তাঁহার দুষ্ট জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত তিনবার তাঁহাকে মারিবার উপক্রম করে ; প্রথমে পয়সা দিয়া গুণ্ডা লাগাইয়া ; পরে, তাঁহার উপরে বৃহৎ শিলারাশি নিক্ষেপ করিয়া এবং শেষে তাঁহার উপরে এক উন্মত্ত হাতী ছাড়িয়া দিয়া। বলা বাহুল্য, দেবদত্তের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল ; গুণ্ডারা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়, প্রস্তর থামিয়া পড়ে, এবং হস্তী বুদ্ধের সম্মুখে ধীরভাবে অবনত হইয়া থাকে। সাঞ্চীর উৎকীর্ণ শিলাফলক-সমূহে এই সকল ঘটনার নিদর্শন আছে। এই রাজগৃহের নিকট ইন্দ্রশৈল গুহায় যখন বুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন ছিলেন, তখন ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার পূর্ব্বাবধিই বুদ্ধের প্রধান সহায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র পিতৃহন্তা অজাতশত্রু প্রথমে দেবদত্তের পোষকতা করিয়া বুদ্ধের শত্রুতা সাধন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু শেষে তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

(১০)

বুদ্ধত্ব লাভের এক বৎসর পরে (দ্বিতীয় বৎসরে) পিতা শুদ্ধোদনের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া বুদ্ধদেব কপিলাবাস্তুর প্রাচীন রাজপ্রসাদে গমন করেন। তাঁহার বর্ত্তমান নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি নগরের বাহিরে কোন উদ্যানে অবস্থান

করেন। সেইখানে তাঁহার পিতা এবং শাক্য রাজকুমারগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেই সময়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে আগে কাহাকে অভিবাদন করিবেন? বুদ্ধ অবিলম্বে নিজেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি দৈবশক্তিতে উর্দ্ধাকাশে উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক উপদেশাত্মক ধর্ম্মবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন জনক বিস্মিত হইয়া পুত্রের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন এবং থাকিবার জন্য তাঁহাকে বটবন প্রদান করিলেন। বুদ্ধের কপিলাবস্তুতে এই গমনের পরেই শাক্যবংশের অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন; তাহার মধ্যে আনন্দ, অনিরুদ্ধ, ভাদ্দীয়, ভাগু, কিম্বিল এবং দেবদত্ত প্রধান।

(১১)

যাঁহারা গৌতমের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে ছয় মাস তীর্থিকই প্রধান। ইহারা প্রত্যেকেই নাস্তিকদলের নেতা। ইহাদিগের নাম—পুরাণ, কাশ্যপ, মাখ্‌খালি গোশাল, অজিতকেশ, কম্বলী, পকুথ, কচ্ছায়ন, নিগন্থ নাটপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলাথিপুত্ত। শেষোক্ত তীর্থিক কিছুকাল সারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল নাস্তিক দলপতি সেই সময়ে প্রসেনজিতের সভায় থাকিতেন; তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার মানসে বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবস্তীতে গমন করেন এবং তথায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধদিগের প্রবর্ত্তিত ও আচরিত নিয়মানুসারে অনেক বিস্ময়কর ও অলৌকিক অঘটন ঘটনা সংঘটিত করেন। তিনি ব্যোমমার্গে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্‌বলয় বিলম্বিত এক মহাপথের আবিষ্কার করিয়া তাহাতে আরোহণ করেন। তাঁহার শরীরের উর্দ্ধভাগ হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা ও নিম্নভাগ হইতে বিস্ফুরিত অনন্ত অগ্নিশিখা নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলৌকিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে এবং সেই হেমকান্তি দিব্যালোকে চারিদিক্ প্লাবিত হইয়া যায়। তিনি তখন সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করেন এবং তাহাদিগের সকলকে সত্যপথের সন্ধান শিক্ষা দেন।

(১২)

এই অদ্ভুত ব্যাপারের পরে বুদ্ধদেব শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন। তথায় জননী মায়াদেবী ও দেবলোকের আতিথেয়দিগকে অভিধর্ম্মের ব্যাখ্যান দেওয়াই তাঁহার মনোগত ছিল। তিনি তিন মাস সেই স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পরে মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া

আসেন। আসিবার সময়ে ইন্দ্র আকাশপথে তাঁহার জন্ত এক দিব্য মণিময় সিঁড়ি ঝুলাইয়া দেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র উভয়েই তাঁহার অনুগমন করেন; ব্রহ্মা দক্ষিণভাগে স্থবর্ণময় সোপানে এবং ইন্দ্র বামভাগে স্ফটিকময় সোপানে তাহার সঙ্গে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন। যে স্থানে তিনি সেই সময়ে মর্ত্ত্যলোকে পদার্পণ করেন তাহার নাম সাংকাশ্য (সংকাশ্য বা সংকিস্সা)।

(১৩)

আশীবৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের মৃত্যু (মহাপরিনির্ব্বাণ) সংঘটিত হয়। কথিত আছে শুষ্ক শূকরের মাংস অতি মাত্রায় ভোজন করিয়াই তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। পাবা নামক স্থানের চন্দনামে কোন কর্ম্মকার (কাঁসারি) তাঁহাকে খাইবার জন্ত উক্ত মাংস প্রস্তুত করিয়া প্রদান করে। বুদ্ধদেব তখন কুশনগরের (কুশীনগরে—কুসিয়া) পথে যাইতেছিলেন এবং পথিমধ্যে নিজের অন্তিমকাল উপস্থিত জানিতে পারিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী কোন শালবনের দুইটী শালবৃক্ষের মধ্যে শয্যা রচনা করিবার আদেশ করেন। এক পায়ের উপর অন্ত পা রাখিয়া, দক্ষিণ পাশে ফিরিয়া, সিংহের মত, তিনি উত্তর শিরা হইয়া সেই অন্তিম শয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়েও তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং সমাগত ভিক্ষুসংঘকে নানাভাবে আদেশ ও উপদেশ দিতে ক্রটী করেন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগেকে শ্রদ্ধাভরে সম্প্রদায়ের যথানিয়মের অনুবর্ত্তনের জন্ত প্রোৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের সেই শেষ মুহূর্ত্তে ও তাঁহার অনুমতি ক্রমে স্থভদ্র নামক কোন যাযাবর নাস্তিককে তাঁহার সম্মুখে আনা হইয়াছিল। স্থভদ্র বুদ্ধের উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার শেষ শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তখন বুদ্ধদেব স্থভদ্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে এখনও এমন কেহ আছে কিনা যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম কিংবা সংঘ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত আছে। উভয়ে 'কেহই নাই' জানিতে পারিয়া তিনি সকলের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন —"সংসারের যাবতীয় বস্তুনিচয় ক্ষয়ান্ত; স্থতরাং সযত্নে কেবল সেই মুক্তির জন্তই চেষ্টাপরায়ণ হও।"

(১৪)

বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে মুহুর্মুহু বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইয়াছিল। কুশীনগরে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে সেখানকার মল্লরাজগণ অবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত

শালবনে উপস্থিত হইয়া ছয়দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত মিছিলে মিছিলে নৃত্য গীতবাদ্য প্রভৃতি করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের পার্থিব শরীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরে সাত দিনের দিনে আটজন মল্লরাজ সেই সুপবিত্র শব নগরের বাহিরে মুকুট বন্ধন নামক মন্দিরে লইয়া গেলেন। তথায় ৫০০ পাঁচ শত বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া লৌহময় শবাধারে সুরক্ষিত করিয়া বুদ্ধদেবের মৃতদেহ যথা নিয়মে চিতার উপর রক্ষিত করা হয়। কিন্তু প্রিয়শিষ্য কাশ্যপ না আসায় বা উপস্থিত না থাকায় চিতায় অগ্নিসংযোগ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। কাশ্যপ তখন একদল ভিক্ষু লইয়া কুশীনগরের অভিমুখে সত্বর আগমন করিতেছিলেন। উপস্থিত হইয়া কাশ্যপ ভগবানের শবদেহের উদ্দেশে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। চিতার অগ্নিশিখা আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল। সব ভস্মীভূত হইলে অলৌকিক বারিবর্ষণে আবার সেই উদ্দীপ্ত অনলরাশি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

(১৫)

ভগবানের দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইলে কুশীনগরের মল্লগণ সেই ভস্মাবশেষ (অস্থি) সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। অপর অপর সাত জায়গা হইতেও অনেকে ঐ ভস্মাবশেষের কিছু কিছু অংশ দাবী করেন, যথা—মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছাধিগণ, কপিলাবাস্তর শাক্যরাজগণ, অল্লকল্লের (অল্লকাপ্পার) বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয় রাজগণ, বৈঠদ্বীপের (বেথাদীপের) কোন ব্রাহ্মণ; এবং পাবার মল্লগণ। কিন্তু কুশীনগরের মল্লরাজগণ সেই ভস্মাবশেষের কিয়দংশও হাতছাড়া করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক হইতে প্রার্থিগণ আগমন করেন। দ্রোণ নামক কোন ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যস্থতায় আর বেশী কোন বাদ বিসংবাদ ঘটে নাই। তাঁহার পরামর্শমতে সেই ভস্মাবশেষ ৮ আট ভাগ করিয়া আটজনকে দেওয়া হয় এবং পাত্রটীও পুরস্কার স্বরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্রোণকেই দেওয়া হয়।

(১৬)

ইহার কিছুকাল পরে আবার পিপ্পলীবনের মৌর্য্যগণ সেই ভস্মাবশেষের অংশপ্রার্থী হইয়া কুশীনগরে এক দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছুই অবশিষ্ট না থাকায় দূত চিতাভূমি হইতে কতকগুলি অঙ্গার খণ্ড মাত্র লইয়া গিয়া তাহার উপরে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

(১৭)

এইরূপে বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম আটভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে তাহার উপরে আটটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়; তাহার মধ্যে সাতটীকেই মহারাজ অশোক খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্য হইতে সেই সকল ভস্মপুটিকা উঠাইয়া পরে আবারও ভাগে ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই ভস্মাবশেষ সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র নাগরক্ষিত রাম-গ্রামের স্তূপই সম্রাট্ অশোকের সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভারত-মঙ্গল

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

(গান)

বল জয় বল জয়,
বল গৌরবময়ী জগৎ-জননী ভারত-জননী জয়।
বল জয় বল জয়।
তিমিরাবৃত অজ্ঞানমৃত জগতে রশ্মিজাল
মোহ-বন্ধন-কলুষ-নাশন কল্যাণভাত ভাল,
মহীয়ান
মহাপ্রাণ,
বল ভুবন-দুঃখ-দৈন্য-হরণ শোক-অনুতাপ-ক্ষয়,
বল জয় বল জয়।
দিলীপ রাম ভীষ্মার্জ্জুন শিবাজী প্রতাপজী
ক্ষাত্রবীর্য্য রুদ্র-শৌর্য্য দুর্জ্জয় ধীরধী
মহাবীর
স্থায়ী ধীর
ধরিল চরণ-নিয়ে ধরণী সাগর-গিরি চয়,
বল জয় বল জয়।

রাবণ-মধু বৃত্র-দলন দুর্জ্জন-পরিতাপ
অন্যায় অক্ষেমনাশী দুষ্টেরি অভিশাপ,
ত্রাস-নাশ
ছিন্ন-পাশ,
শক্তি পাবক মুক্তি-সাধক জিনিল হীন ভয়,
বল জয় বল জয়।
বুদ্ধ-নানক-নিমাই-কবীর-চরণপূত দেশ
ভব-ভবন মুক্ত-বেদন করিল, হরিল ক্লেশ,
দুঃখ তাপ
নাশে পাপ,
মরণোন্মুখ শাশ্বত প্রাণে অশোক নির্ভয়।
বল জয় বল জয়।
শক্তির সাথে সংযম ক্ষমা, অশুভেরে জিনে প্রেম,
সত্যের তরে সহিতে বেদন নাহি ভীতি, চাহে ক্ষেম,
ক্ষমাবান
গরীয়ান,
ধর্ম্মধাত্রী শান্তিদাত্রী সাম্যসাধিনী জয়,
বল জয় বল জয়।

লোক-শিক্ষা

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আঘাত-প্রাপ্ত দেশগুলি এখন নিজ নিজ সমাজের পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছে। সংস্কারও সকল বিষয়েই আবশ্যক হয়েছে। জনসমূহের শিক্ষাও তার অন্যতম। এই বিষয় উপলক্ষে ইংলণ্ডের শিক্ষা-সচীব The Right Hon, H. A. L. Fisher বলেন যে মনুষ্যত্বকেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করতে হবে। অন্য কোন অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ বলে জীবনসম্বন্ধে লোকের পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল, এখন তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখনকার লোকের বিশ্বাস মনুষ্যত্বলাভেই মানবজীবনের সফলতা, এবং তার জন্য জ্ঞানরাজ্যে, ভাবরাজ্যে এবং আশার রাজ্যে যা কিছু

শ্রেষ্ঠ, তাতে মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে। জনসমূহের শিক্ষার দাবী এই অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত (১)।

Mr. Fisher "জনসমূহের: শিক্ষা" অর্থে "education of the Masses" বাক্য ব্যবহার করেছেন। Masses অর্থে অবশ্য বুঝতে হবে Masses of the people অর্থাৎ জড়পিণ্ডের মত জন-পিণ্ড—আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জিত খণ্ড খণ্ড আধিভৌতিকতা মাত্র। সেটা ইতর মানুষের একটা সমষ্টি বটে, কিন্তু তাতে ব্যষ্টি নাই, ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য সুতরাং নাই। সেখানে মনোজগৎটাই নাই, সুখদুঃখের অনুভূতি নাই। বলা বাহুল্য ভদ্র মানুষের সমষ্টিকে Mass বলা যায় না। কারণ, তাঁদের সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি আছে, একক (unit) আছে, যে এককের ব্যক্তিত্ব আছে, ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য আছে। সমবেত হলে সে এককের শ্রেণী হয়, বর্গ হয়—Class হয়, Mass হয় না। এই শ্রেণী বা বর্গের মূলে আছে আভিজাত্য, মাত্রাবিশেষে ; পরিণামেও আভিজাত্য, মাত্রাধিক্যে। এই অভিজাত বর্গ জনসমূহের (Mass-এর) উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, তাকে স্বার্থ-সাধনের জন্য অধীনতায় রাখেন, এবং তার জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। বিধিব্যবস্থার উদ্দেশ্য অবশ্য জন-পিণ্ডের মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হতে না দেওয়া।

কিন্তু অভিব্যক্তি প্রকৃতির নিয়ম ; জন-পিণ্ডের মধ্যেও তার অস্তিত্ব আছে। সেই নিয়মের বলে জন-পিণ্ডের মধ্যে ব্যক্তিত্ব জন্মে এবং ব্যক্তিত্ব সামাজিকতায় পরিণত হয়। সামাজিকতায় যে শক্তি জন্মে অভিজাত-বর্গ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখবার জন্য জনসমূহকে জ্ঞানবর্জ্জিত করে রাখতে চান। কারণ, জ্ঞান শক্তির সহিত সংযুক্ত হলে দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠে। জনসমূহ বলে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল তাদেরও ভোজ্য, এবং তারা সেই জন্য শিক্ষা চায়। এখন যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তা জীবনের অন্যান্য আরাম, বিলাসের মত অভিজাতবর্গের ভাগ্যেই ঘটে। জনসমূহের ভাগ্যে তা দুর্ঘট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-পাত্রে যে শিক্ষা পরিবেশিত হয়, তা ধনী-সন্তানদেরই ভোগ্য। দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে তা নিষিদ্ধ। Eton এবং Winchester

---

(1) "The education of the masses" declares the Right Hon. H. A. L. Fisher, "rests on the right of human beings to be Considered as ends in themselves, and to be entitled te know and enjoy all the best that life can offer in the Shere of knowledge, emotion and hope."

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় দরিদ্র ছাত্রদের জন্য—"Scholares panperes et indigentes." কিন্তু যখন কলেজগুলির সংস্কার হয়, দরিদ্র ছাত্রকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হল। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একবার একটি Royal commission নিযুক্ত হয়। এক কলেজের অধ্যক্ষ সেই কমিশনের কাছে বলেছিলেন "We do not want poor men, but able men." এর উত্তরে কমিশন তাঁদের রিপোর্টে লিখেছিলেন "the State does not want either." ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অকটোবর মাসের Pilgrim পত্রিকায় একজন লেখক বলেন "Money shall not purchase education for boys." সকল বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধেই এইরূপ বলা যেতে পারে। তার পর, প্রাথমিক শিক্ষা নামে ধনীসন্তানদের যে উচ্ছিষ্টাবশেষ দরিদ্র সন্তানকে বিতরণ করা হয় (অবশ্য বিনামূল্যে নয়), তাতে না বাড়ে জ্ঞান, না বাড়ে ব্যবসায় বুদ্ধি, না বাড়ে কর্ম্মশক্তি। অহৈতুকী ভক্তির দিন গিয়েছে। এ শিক্ষার উপরেও লোকে ভক্তি হারিয়েছে।

সমাজ সুবিধামত ভুলে যায় যে শরীর ও মনের সমবায়েই মানুষের জীবন এবং শরীরের পুষ্টির জন্য আহারের যে প্রয়োজন, মনের পুষ্টির জন্য শিক্ষারও সেই প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করলে, মানুষের জীবনের অর্দ্ধেককে—উৎকৃষ্ট অর্দ্ধেককে – পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করা হয়। সমাজের কর্ত্তারা আরও ভুলে যান যে মানুষের মধ্যে দরিদ্রই অধিকাংশ। এই অধিকাংশকে বাদ দিয়ে অল্পাংশের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধানই এ পর্য্যন্ত সমাজ করে এসেছে। সংস্কার বলতে এ পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর এবং মধ্য শ্রেণীর উন্নতিই বুঝিয়েছে। নিম্নশ্রেণী বা জনসমূহ কখন গণনার মধ্যে আসে নি। ফলে অল্পাংশ নিয়ে যে সমাজ তা বিকলাঙ্গ ক্ষীণ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এখন সমাজকে পূর্ণাঙ্গ, পুষ্ট ও সবল করতে হলে যে দরিদ্র জনসমূহকে পূর্ব্বে অবহেলা করা হয়েছিল, তাকে আবার আদর করে ডেকে সমাজে স্থান দিতে হবে। প্রাচীন সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তা করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। তাই অর্ব্বাচীন রুশীয় সমাজ নতুন উৎসাহে এই কার্য্যে অগ্রসর হয়েছে।

আজকার শিশু কালকার মানুষ এবং পরবর্ত্তী বংশীয়ের জনক, নেতা ও উপদেষ্টা। এ কথাটা পুরোনো এবং সকল সমাজেই প্রচলিত আছে। এবং পুরোনো বলেই, বোধ হয়, লোকের মনে তার আর তেমন প্রভাব নাই। অন্ততঃ যে প্রভাব থাকলে মনের ভাব কাজে পরিণত হয়, সে প্রভাব নাই।

যে একটু আছে তাতে অভিজাত সন্তানদের, ধনীসন্তানদের, জন্য কিছু কিছু শিক্ষার আয়োজন হয়েছে। দরিদ্রসন্তান এখনও সমাজের অযত্নে, অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে। রুশিয়ার নতুন সমাজ আজ তাই তার ভবিষ্যদ্‌বংশীয়ের জনক, নবগঠিত সমাজের নেতা ও উপদেষ্টা ও জনতন্ত্ররাষ্ট্রের কর্ম্মী বলে তার শিশুশিক্ষার অদ্ভুত আয়োজন করেছে। Mr Goode. বলেন "শিক্ষার বিষয়েই আমার জীবন অতিবাহিত করেছি, এবং তাতে বিশেষজ্ঞ বলে কিছু খ্যাতিও উপার্জ্জন করেছি। সেই বিশেষজ্ঞতার বলে আমি বলতে পারি যে রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট শিশুমঙ্গলের জন্য যতটা চিন্তা ও যত্ন করেছেন, পৃথিবীর আর কোন গবর্ণমেণ্টকে সেরূপ করতে দেখিনি। ষোলবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হয়। অন্য অন্য আবশ্যক সামগ্রীর দানেও কিছুমাত্র কৃপণতা নাই। অবস্থার প্রতিকূলতার জন্য আর যার যে কষ্টই হ'ক, শিশুদের কেন বিষয়ে কোন কষ্ট নাই। তাদের শিক্ষার জন্য বেতন নেওয়া হয় না। শিক্ষাকে এমন ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হয়েছে এবং তার বহুল প্রচারের জন্য এমন উপায় অবলম্বন করা হয়েছে যে তা দিয়ে নিরক্ষর রুশীয় জনসমূহের বহুকাল-সঞ্চিত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হবে এমন আশা করা যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ অকটোবরের ক্রাসনায়া গেজেটে (Krasnaya Gazette) বর্ণিত হয়েছে যে যে-ছেলে এখনও মার কোল ছাড়ে নি তাদের জন্যও শিশুনিবাস (children's home) হয়েছে। এই শিশুনিবাসে এখন (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে) ৫০০ শিশুকে পালন করা হয়। এই শিশুদের বয়স তিন বৎসরের অনূর্দ্ধ। তিন বৎসর থেকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র নিবাস আছে। এ ছাড়া ছেলেদের স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। যে সকল ছেলেদের স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন আবশ্যক,এই সকল স্বাস্থ্য-নিবাসে রেখে তাদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করা হয়। Gatchino, Tzarskoe Selo, Sestrorezk এবং Grafski stationএ এইরূপ স্বাস্থ্য-নিবাস খোলা হয়েছে। এগুলি সবই পল্লীগ্রাম, পেট্রোগ্রাড থেকে বেশী দূর নয়। এ ছাড়া যুবকদের বিবিধ জ্ঞান উপার্জ্জনের সুবিধার জন্য কর্ম্ম-শিক্ষালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, জনসাধারণ-সমিতি প্রভৃতি আছে। মস্কো নগরে যুবকদের এইরূপ জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা কৃত্রিম উপায়ে আর উদ্রিক্ত করতে হয় না, তারা এখন স্বতঃই মহা-উল্লাসে এই সকল শিক্ষা স্থানের সদ্ব্যবহার করে। পল্লীগ্রামেও এই শিক্ষা পিপাসা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মেছে। কৃষকশ্রেণীর মধ্যেও নর, নারী, যুবক, প্রৌঢ় সকল রকমের লোক সকল রকম শিক্ষায় শিক্ষিত

হবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। Mr. Goode বলেন রুশিয়ার জনসাধারণের হৃদয়ে জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদনের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা বদ্ধ হয়ে ছিল। এখন এই নতুন সামাজিক আবর্ত্তনে তার একটা সতেজ স্ফুরণ হয়েছে। তিনি বলেন শিশু-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই যে এই সকলের মূল উদ্দেশ্য তা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে সময়ের কথা বলেন সে সময়ে রুশিয়ায় দুর্ভিক্ষ হয় নি, কিন্তু সহরে খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হয়ে ছিল। পল্লীগ্রামে খাদ্যদ্রব্য সুলভ এবং প্রচুর ছিল। সহরের দুর্ম্মূল্যতা ছেলেদের আহার-বিষয়ে কোন ব্যাঘাত বা ত্রুটি না উৎপাদন করে, সেই উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মকালে তাদেকে সহর থেকে পল্লীনিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। অবকাশের সময়ে পড়াশুনা বন্ধ হলেও শিক্ষালয়গুলি বন্ধ হয় না। কারণ, তাতে ছাত্রদের আহারে বিশৃঙ্খলা ঘটবার সম্ভব। শিক্ষার এই আয়োজন ছাড়া, ছাত্রদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থারও ত্রুটি নাই। কেবল ছেলেদের জন্যই মস্কো নগরে প্রতি রবিবার অপরাহ্নে সাতটা থিয়েটার চলে।

শিশুদের কল্যাণের জন্য সন্তান-সম্ভাবিতা নারীদের পর্য্যন্ত রীতিমত সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় যথোচিত যত্ন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পরিচর্য্যা, পথ্য এবং চিকিৎসা কিছুরই কোন ত্রুটি নাই।

উপসংহারে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে এই সকল অনুষ্ঠানের জন্ত অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র কৃপণতা নাই। সকল কাযই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করবার জন্ত প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করা হয়। (১)।

---

(1) Bolshevism at Work George Allen, & Mewin Ld.

জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য*

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

জাতীয় জীবনের নব জাগরণের দিনে একটা নূতন ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া জাতি গড়িয়া উঠে। কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে বা কোনও একটা বিশেষ কারণে সেই ভাবধারা দেশে আসিয়া দেখা দেয়, কিন্তু সেই ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখে জাতীয় শিক্ষা। সকল দেশেই জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সমভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এমন কোনও কথা নাই। যে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের গতির সঙ্গে সম তালে চলিতে সমর্থ হয় নাই, বা চলিতে চেষ্টা করে নাই, সে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি নব যুগের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে আবার যে দেশের শিক্ষার বিধি তাহার জাতীয় জীবনকে একটা নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া একটা নূতন শক্তির বলে অগ্রসর হইয়াছে, সে দেশের শিক্ষা সমাজকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া জাতীয় জীবনের একটা নবতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে সকল জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠিত বা স্বনিয়ন্ত্রিত, তাহাদের শিক্ষার পদ্ধতি ধীরেই হউক অথবা দ্রুতবেগেই হউক জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ সে সকল জাতির নিকট আপনিই ধরা পড়িয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় জীবনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; বাস্তবিক এই দুইটি এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে একের সুব্যবস্থায় অপরের সুগঠন অবশ্যম্ভাবি। আর একের শৃঙ্খলায় অপরের ধ্বংস সুনিশ্চিত। জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নূতন ভাবধারার বিকাশসাধন আর জাতীয় জীবনের অভিপ্রায় তাহার ফলভোগ করা। সুতরাং এ উভয়ের সম্পর্ক ঠিক সঙ্গীতের তাল ও সুরের মত। জাতীয়শিক্ষার সহিত সম্পর্কহীন জীবন যেমন পঙ্গু, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষাও তেমনি অসম্পূর্ণ।

---

* জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিব। এই সকল প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় আলোচিত হইবে—জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি, জাতীয় শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য, জাতীয়শিক্ষায় স্বাদেশিকতার প্রেরণা, জাতীয় শিক্ষার অর্থকরী দিক ও আদর্শ বিদ্যালয়।

শিক্ষার প্রভাব জীবনের উপর এত অধিক যে তাহা অস্বীকার করা একটা জাতির পক্ষে আত্মহত্যার স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে জাতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের গঠন অনেকাংশেই নির্ভর করে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে শিক্ষার সার্থকতা বা ব্যর্থতা অনেক পরিমাণে জাতীয় জীবনের ও জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্য বা দৈন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষের দেহের হ্রাস বৃদ্ধির উপর তাহার বিশেষ কোনও হাত নাই, কিন্তু মনের হ্রাস বৃদ্ধি মানুষের অনেকটা ইচ্ছাধীন। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি মানুষ তাহার মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে এবং সেই গঠনের ভিতর মানুষের ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সুতরাং সমাজ ও সভ্যতাকে জাতীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় একটা নূতন সুর দিতে হইলে দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয় যাহারা তাহাদের প্রাণে নূতন ভাবের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং একমাত্র জাতীয় শিক্ষাই সেই নূতন সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে পারে। কারণ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে আজ যাহারা ছাত্র তাহাদিগকে ভবিষ্যতের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগের অন্তরে নূতন জ্ঞানসঞ্চয় ও নূতন কর্ম্মকৌশল লাভের প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করিতে পারে এবং যতটা কর্ম্মশক্তি লাভ করিতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু দুটিই আসলে মনের লীলা এবং এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে এই একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যাহা আমাদের "আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার" সহায়। অবশ্য এ প্রচেষ্টা জীবমাত্রেরই সহজাত এবং মানুষেরও সেই কারণেই এ প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। কিন্তু পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এইখানে যে আমাদের ভিতর আর একটী প্রবৃত্তি রহিয়াছে, উহার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমরা কেবল জীবন রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, আমরা মনে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে পৌছিবার সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া থাকি এবং জাতীয় শিক্ষাই এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। সুতরাং শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশসাধন হয় এবং যাহার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হইয়া জাতীয় জীবনকে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্যে ভরপুর করিয়া তুলে।

শিক্ষার এই যে আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তোলা, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষায় সম্ভবপর হয় নাই। কারণ এ শিক্ষা জাতীয় জীবনের ধারাকে অবহেলা করিয়া বিজাতীয় হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এলাহাবাদে শিক্ষা-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"এ দেশের ছাত্রেরা এই শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় আদর্শ ও ইউরোপীয় সাজসজ্জা ধরিয়াছে। তাহারা ইংরাজিতে চিন্তা করে, সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্য ও ব্যবসা-বানিজ্য ইংরাজিতে পরিচালনা করে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষার ফলে এ দেশের শিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে এই অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হইত না, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সেকালের শিক্ষার ভিত্তি ছিল; এইরূপ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আজও ভারতীয় সভ্যতা হাজার হাজার বর্ষের বিপ্লব ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া সজীব। বৈদেশিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া হয়ত আমাদের সভ্যতাকে কোন কোন বিষয়ে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন কিছুতেই সমীচীন নহে।"

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান দোষ এই যে ইহা আমাদের সম্মুখে বিদেশী সভ্যতার আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের ধারায় যে আদর্শ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ইহা একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। বিদেশী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রভাবে পরিচালিত শিক্ষায় জাতীয় চরিত্রের বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠিত শিক্ষায় বিদেশী হাবভাব বিদেশী পোষাক পরিচ্ছদ ও বিদেশী ভঙ্গী ছাত্রের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া যায় যে তাহার সমগ্র প্রকৃতিটা বিজাতীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং ভারতের শিক্ষা ভারতবাসীর দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া সে শিক্ষাকে গড়িয়া তুলিবে। ভারতের সাধনা জ্ঞান ও চরিত্রপ্রভাবের আদর্শ তাহাতে ফুটিয়া উঠিবে, ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতার যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহা সেই শিক্ষার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইবে।

জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে জীবনের বিকাশসাধন, সে বিকাশেই প্রকৃত স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। মানুষ আত্মচেষ্টার বলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাধা অতিক্রম করিয়া—আত্মোন্নতি সাধন করিবে, ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার জালকে ছিন্ন করিয়া—

দাঁড়াইতে হইলে তাহার জীবনের জটিলতা তাহাকে দূর করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে ভারতের প্রাচীন জাতীয় শিক্ষা অনেকাংশে সফল হইয়াছিল, তাহাতে জীবনের সরল পথ এমন ভাবে দেখাইয়া দিয়াছিল যে উহাতে একসঙ্গে মিতাচার ও উচ্চচিন্তা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের ধারায় অনুসরণ করিলে এবং ভারতের প্রত্যেক ধর্ম্মের আন্দোলনের আভ্যন্ত প্রণিধান করিলে এই কথাই স্পষ্ট মনে হয় ভারতবাসীর জীবন যখন সরল পথে চলিতে পারিত তখনই জ্ঞানের বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিতে সে সমর্থ হইয়াছে। সেই সরল যৌগিক সাধনার দিনেই হিন্দুর অনন্তগৌরব উপনিষদের জন্ম হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালেও নালন্দা ও তক্ষশিলার বৌদ্ধ মঠ ও বিহারে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান গরিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহপর ইসলাম ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়, আবুবকর ও প্রাচীন মুসলমান পীরগণের সাধনায় বিশ্বমৈত্রীর যে জলন্ত সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও ইসলাম ধর্ম্মকে ধন্য করিয়া রাখিয়াছে।— সুতরাং জাতীয় শিক্ষার ইহাও একটা প্রধান উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত জীবনকে সরল করিয়া—তাহার মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য মনকে গড়িয়া তোলা। যে শিক্ষায় মনের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার বিলোপ সাধন হয় বা তাহার বিকাশের পথে বাধা আসিয়া পড়ে, সে শিক্ষার মত জাতীয় জীবনের আর কিছুই এত অনিষ্ট করিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের মনে কতকগুলি উচ্চভাব ও উচ্চ চিন্তা এবং নিজের বলিয়া কিছু বৈশিষ্ট্য আছেই, ভগবান তাহাকে এই পৃথিবীতে পাঠাই-বার সময়ে কিছু শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছেন নিশ্চয়ই। তাহার কর্ত্তব্য সেই শক্তির মূল অনুসন্ধান করিয়া উহার পূর্ণ পরিণতির জন্য চেষ্টা করা এবং তৎপরে সেই বিকশিত শক্তির সদ্ব্যবহার করা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনের এই যে গুপ্ত শক্তি তাহাকে বাহির করিতে সাহায্য করা। সুতরাং অপরিণত মনের সম্মুখে এমন কোনও বহিরারোপিত বিজাতীয় আদর্শ ধরিতে নাই, যাহাতে উহা পঙ্গু হইয়া যাইতে পারে। বিধাতার বিধানে প্রত্যেক জাতিকে তাহার জাতীয় অতীত জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হইবে, বর্ত্তমান জ্ঞানসৌধের রক্ষক হইতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানের স্রষ্টা হইতে হইবে, তাহার জাতীয় সাধনার মধ্য দিয়া তাহাকে এই সমস্তের উপযোগী হইয়া ফুটিতে হইবে। ইহাই জাতীয় শিক্ষার কার্য্য।

জগতের মধ্যে প্রত্যেক জাতির একটা বিশিষ্ট অধিকার আছে, জাতীয় শিক্ষা

তাহাকে সেই অধিকারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবে। বর্ত্তমান যে শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ "জাতীয় বিদ্যালয়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল কলেজে যেশিক্ষা লাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পলিটিক্যাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল্ ইকনমি। যাহা কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে, সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলিতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা স্থির করিয়াছি ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে, জাতি মাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্য-দেশের শাস্ত্রসম্মত, তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য-দেশের প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র। মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনো-মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা কি, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন, সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্ত্তি কি ভাবে দেখা যায় শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহা আবিষ্কার করিলাম কই? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুথি আওরাই।

শিক্ষা আমাদিগকে এমনিভাবে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।"

প্রকৃত শিক্ষা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন-উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ইহা সমাজের মানসিকউৎকর্ষের সহায়তা করিবে, জনসাধারণের মনকে গড়িবা তুলিবে, জাতীয় চিন্তার ধারাকে পরিশুদ্ধ করিয়া জাতীয় আকাঙ্ক্ষার একটা বিশুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া ধরিবে এবং সাধারণ লোকের পারিবারিক জীবনেও

একটা শান্তির ধারা বহাইতে চেষ্টা করিবে। শিক্ষাই মানুষের স্বাতন্ত্র্য আনিয়া দিবে, তাহার নিজের অভিমত ব্যক্ত করিবার শক্তি দিবে এবং সেই অভিমত অনুযায়ী কার্য্য সাধনের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবে। শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা ফুটাইয়া তোলা এবং ইহাতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত চরিত্রের বিকাশসাধন হইবে। H. G. Wells তদ্রচিত "Outline of History' গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন– "Presently education must become again in intention and spirit religious and the impulse to universal service, and to devotion to universal service, and to a complete escape from self will reappear again, stripped and plain, as the recompensed fundamental structual impulse in human society" অর্থাৎ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মগত ও ব্যক্তিগত সাধনা, সার্ব্বজনীন সেবা ও পরার্থপরতা যাহা মানব সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়তা করিবে তাহাই হইবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন ইহা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে সে উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নহে। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে শিক্ষায় যদি মনের উৎকর্ষ সাধিত না হইল,তবে একটা জাতির জীবন মরণ সমস্যার মীমাংসাই বা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে। Lord More ley এ সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন—"The questions of National, Education, answers them as you will, touch the life and death of nations" অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষার সমাধান যেমন ভাবেই কর না কেন, এ কথা মনে রাখিতে হইবে ইহাতে যেন জাতির জীবন মরণ সমস্যার সমাধান হয়।

বাস্তবিক জাতীয় শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই মানুষের দেহ মন আত্মার প্রকৃষ্ট উন্নতিসাধন। ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে ভারতের মাটীতে গড়া ছাত্রের মধ্যে যে বিশিষ্টতা তাহাই ফুটাইয়া তোলা, তাহার মধ্যে যে ভারতীয় সংস্কারের লীলাধারা ফল্গুনদীর মত বহিয়া যাইতেছে, তাহাকেই ওতপ্রোত ভাবে বহাইয়া দেওয়া অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্যই হইবে যে ভারতবাসীর মনে যে জাতিগত সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহাকে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া; সেই সুযোগ পাইলেই পূর্ণ পরিণতির জন্য তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। একটা সহজ নিদর্শন দিয়া বোঝান যায় যে জাতীয়

শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ; জাতীয় সংস্কার যখন মানুষের মনে প্রথম অবস্থায় থাকে, তখন তাহা একটি গুল্মের মত, তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া পূর্ণপরিণতির পথে আনিতে হইলে প্রথমে তাহার চারিদিকে যে কাঁটাবন বা জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহাকে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং তাহার পর সেই গুল্মটিকে বিশুদ্ধ জল বায়ুর দ্বারা সেবন করিতে হইবে; জাতীয় শিক্ষা জাতীয় সংস্কারকে ঠিক এমনিভাবে গড়িয়া তুলিবে, প্রথমে উহার উপর যে বিদেশী ছাপ পড়িয়াছে তাহাকে সরাইয়া ফেলিবে এবং পরে উহার পরিণতির উপযোগী উপায় অবলম্বন করিবে। সুতরাং জাতীয়শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র বিদ্যালাভ করা নহে, তাহাতে শ্রদ্ধা,নিষ্ঠা ও শক্তিলাভ হইবে, তাহাতে শিক্ষার্থীরা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়—দ্বিধা-বর্জ্জিত হইয়া তাহারা যেন আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে—তাহারা যেন অস্থি মজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

অন্বেষণ।

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

[শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া শারদীয়া পূর্ণিমা রজনীতে গোপিগণকে আহ্বান করিয়া মুরলীবাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দরীগণ বেণু-মোহে মুগ্ধ হইয়া সংসারের কাজ ফেলিয়া বৃন্দারণ্যে ধাবিত হইল। যখন তাহারা কৃষ্ণ-চরণে আসিয়া একে একে মিলিত হইল তখন কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে সতী ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝাইয়া ভবনে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা ফিরিল না, বলিল—শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের পতি, তাহাদের পতিগণের পতি, সর্ব্ব জীবের অন্তর-বাসী। ব্রজ মঙ্গলের জন্য ভগবান্ নন্দ-গৃহে কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। তাহারা ভগবানের চরণ হইতে এক পদও বিচলিত হইবে না। গোপিগণের একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের সহিত বন-বিহারে রত হইলেন। কৃষ্ণ-সঙ্গ পাইয়া তাহাদের মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। অমনি ভগবান্ তাহাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাহারা মনের দুঃখে প্রাণ-বন্ধুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমন করিতে লাগিল! এই ভগবদন্বেষণই বর্ত্তমান কবিতার আখ্যান বস্তু।]

১

মন্মথ-মথন সেই প্রাণ-মন-রম
নাথের মূরতি যবে লুকাল সহসা,
যূথ-পতি অদর্শনে করী-যূথ সম
কাতরে কাঁদিলা গোপী বিরহ-বিবশা।

২

মনে পরে সেই কুঞ্জর গতি
বঙ্ক চাহনি মধুর হাস,
মনে পড়ে সেই বঁধুর আরতি
মধু আলাপন রতি বিলাস।
বঁধুয়ার সেই বিবিধ বিহার
ভাবিতে ভাবিতে প্রমদাগণ
একে একে সবে বঁধুর আচার
অনুকরে বঁধু মগন-মন

৩

বঁধুর কটাখ বঁধুর গমন
বঁধুর হাসিটি বঁধুর স্বর
করি অনুকার আবেশে বালার
ঘটে বঁধু ভ্রম আপনা পর।
নেহারি কাহারে কৃষ্ণ-কামুক
কহে বঁধুময়ী—"এই যে আমি,"
কভু ধরি করে অপরা চিবুক
বঁধু-বোধে চুমে বদন খানি।

৪

সমদশা যত ব্রজ-অঙ্গনা
বঁধুর বিরহে পাগলী পারা
বঁধু গুণগান করিতে করিতে
বন হ'তে বন ঢুঁড়িছে তারা

ব্যাপি চরাচর বহিরন্তর—
রহে যে পুরুষ গগন প্রায়,
প্রতি তরুলতা পাশে তাঁরি কথা
পুছে ব্রজবালা ধরিয়া পায়।

৫।৬

"হে বিরাট বট! অশথ বিশাল!
বন-হরিতকা! কহ ত শুনি
প্রেমের দিঠিতে হাসিতে রসাল
মন হরি' কোথা গেল সে গুণী?

"নব কুরুবক! চারু চম্পক!
পুন্নাগাশোক! নাগকেশর!
মান হরে যাঁর হাসির চমক
কোথা গেল সেই রাম-দোসর?

৭

"মাধব-চরণ-চুম্বিনি অয়ি
চিরকল্যাণি তুলসি! তুমি
উন্মদ অলিঝঙ্কারময়ী,
অচ্যুত-হৃদি বিহার-ভূমি।

"তুমি ত রমণী, রমণীর দুখে
বিগলিবে তব করুণ হিয়া,
কহ লো সজনি! গেলা কোন্ মুখে
প্রাণ-বল্লভ এ পথ দিয়া?

৮

"ওগো মল্লিকে! লো জাতি যূথিকে!
মালতি লো! তোরা বঁধুর পিয়া,
বুঝি সে তোদিকে কাননে আজিকে
কোটালে করের পরশ দিয়া!

"তোরাত ফুটিলি নাথের পরশে
উথলে উরসে হরষে মধু,
বল্ না ফুটিয়া কোথায় নিবসে
এবে লো মোদের পরাণ-বঁধু ?

৯

"হে চুত ! পিয়াল ! রসাল ! তমাল !
ঘন দেবদার ! পলাশ' জাম !
বিটপ-বহুল বিল্ব বকুল !
ধূলি-কদম্ব পুলক-দাম !

"তোম্‌রা যাহারা পর উপকারে
যমুনার কুলে জনম নিলে,
শূন্য-হৃদয়া বল সবাকারে
কৃষ্ণ-পদবী কেমনে মিলে ?

১০

"কত তপ তুমি করিলা ধরণি !
পুণ্যময়ি গো ! জীবনে তব,
তাই বুঝি দেহে লাগিলা সজনি !
হরি-পদ-পরশনোৎসব ?

"অঙ্গে অঙ্গে শষ্প-পুলক
জাগিল কি আজি সে পদ-পাতে
অথবা ফুটিছে সুখ-কণ্টক
আজিও বামন-চরণাঘাতে ?

"কিংবা যে সুখ দানিলা তোমারে
বরাহের রূপে বাঁধিয়া বুকে,
সে সুখ স্মিরিতি হৃদয় মাঝারে
আজো থাকি থাকি উঠিছে ফুটে ?

১১

"অয়ি লো হরিনি! বিলোল লোচনে
একি লো তৃপ্তি নেহারি আজ?
হরি-প্রিয়া তুমি, হরি-দরশনে
উথলে হরষ নয়ন মাঝ?

"কোরেছিলা বুঝি সোহাগ যতন
গমনের কালে তোমারে হরি?
থুয়েছিলা ক্ষণ জলদ-বরণ
কুন্দ-মালিকা কণ্ঠ পরি?

"তাই কি হেথায় পেতেছি মধুর
গোকুল-পতির দেহের বাস?
বক্ষ-জড়িতা বরজ-বধূর
কুচ-কুঙ্কুম-সুরভি রাশ?

১২

"কেন নত শির ওগো তরুগণ!
তোমাদের তলে আলো করি বন
রামানুজ যবে দাঁড়াল আসি,
গোকুল-নাথের চরণের তলে
নোয়াইয়া মাথা নত ফুল ফলে
প্রণমিলে বুঝি পুলকে ভাসি?

"বুঝি বা তখন বঁধু পাশে ছিল
প্রিয়তমা কেহ? তাহারে ধরিল
বাম বাহুখানি রাখিয়া কাঁধে?
তুলসীমালার গন্ধে অন্ধ
সঙ্গে চলিছে মধুপবৃন্দ,
ডাহিন ভুজে কি বীজন-চপল
ঘুরায়ে বঁধুয়া লীলা-উৎপল
বারিতে আছিল ভ্রমর-বাধে?

বন্ধ ছুকর, কেমনে শ্রীপতি
নন্দিল কহ তোমাদের নতি ?
বুঝি বা প্রণয়-পূরিত লোচন
ভঙ্গীতে করি অঙ্গীকার,
সহসা লুকা'ল কান্তার সাথে
দূর বনে দ্রুত চরণে তাঁর ?"

১৩

"ওলো সই শোন"—কহে গোপী কোনো—
"সন্ধান যদি চাহ বঁধুর,
পুছ তবে এই লতাবধুগণে
কোথা গেল সেই চোর চতুর ?

বনস্পতির বাহু-বেষ্টনে
বাঁধা আছে, তবু দেখলো সখি'
বরজ-নাথের নখর-পরশে
হের সারা তনু গোপন হরষে
উঠে কাঁটা দিয়া পুলকে সখি !"

১৪

পাগলীর মত প্রলাপ বচন
কহিতে কহিতে ব্রজবধূগণ
বঁধুরে ঢুঁড়িয়া বুলে ;
বিরহোন্মাদে হ'য়ে উন্মনা
বঁধুর মাঝারে হারায়ে আপনা
করিতে লাগিল পরাণ বঁধুর
কোমল কঠোর লীলা সুমধুর
অভিনয় মন-ভুলে।

———

বন্দী-জীবন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল।)

(৭)

এবার পাঞ্জাব হইতে নবীন উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া ফিরিলেও কাশী আসিয়া মনে হইল যেন এত দিন কত অনাচার অনিয়মের মধ্যে ছিলাম, আর পাঞ্জাবের তুলনায় কাশীকে কত মনোহর কত পবিত্র মনে হইল তাহা আর বলিতে পারি না। কেন যে এরূপ মনে হইল তাহা জানি না তবে এবার কাশীর যে স্নিগ্ধরূপ অনুভব করিয়াছিলাম বহুদিন কাশীতে থাকিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। কাশীর বাতাস গায়ে লাগিতেই যেন মনে হইল কতদিনের অপবিত্র দেহ শুদ্ধ হইয়া গেল, একটি দিন মাত্র কাশীতে থাকিয়াই মনে হইল কতদিনের সঞ্চিত গ্লানি যেন সহসা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। বিপ্লব পণ্ড হইবার পর রাসবিহারী যখন কাশীতে ফিরিয়া আইসেন তখন তিনিও নিজের মনের ঠিক এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

কাশী ফিরিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলার একজন নেতার সহিত দেখা হইল। আমার পূর্ব্ব পরিচিত কএকজন নেতা ইতি পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া যান, তাই বিপ্লবের এমন আশার দিনে পূর্ব্ব পরিচিত সকলকে জেলে হারাইয়া কেমন এক অনির্দ্দিষ্ট বেদনা অনুভব করিতে ছিলাম, নানা কাজের ফাঁকে কত সময় এই কথাই মনে হইতে-ছিল, আজ তাঁহারা কেন আমার সঙ্গে নাই? সেদিনের সেই আনন্দ সকলে মিলিয়া ভোগ করিতে না পারায় সময়ে সময়ে সেই বিচ্ছেদ প্রাণকে কত ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল।

কলিকাতা অঞ্চলেরও এক সুপ্রসিদ্ধ নেতা, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সময় কাশী আসিয়াছিলেন। বিপ্লব যুগের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদিগের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। ইতিহাসে প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে যখন কোনও নূতন আন্দোলন সমাজের অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করে তখন সেরূপ আন্দোলনের যাঁহারা প্রাণ তাঁহাদের চরিত্র অনন্যসাধারণ না হইলে সেরূপ আন্দোলন টিকিতেই পারে না। তাই যখন কোনও সম্প্রদায় রাজরোষে

অথবা সমাজের নিগ্রহে নিপীড়িত হইতে থাকে তখনও যাঁহারা সেই সম্প্রদায় ভুক্ত হন তাহাদের চরিত্রের মধ্যে নিশ্চয় কোনও বিশেষত্ব থাকে। তাই এই রূপ সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা অল্প হইলেও সমাজের উপর ইহার প্রভাব বড় অল্প হয় না। বিগত বিপ্লব যুগের ইতিহাস হইতেও এই সত্যের যথার্থতা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। যতীন বাবু এইরূপ সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর স্বীয় চরিত্র বলে আপনার সুদৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বিপ্লবের কার্য্য অতি গোপনে করিতে হইত বলিয়া এবং তেমন তেমন শক্তি শালী মহাপুরুষের সর্ব্বগ্রাহী প্রতিভার আশ্রয়ের অভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের কত যে বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিয়াছিল তা হয়ত আজও ভালরূপে জানা যায় নাই। এইরূপ হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। এইরূপ বিভিন্নদল যাহাতে সম্মিলিত হইয়া একবিরাট দলে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ হইতেছিল কিন্তু তেমন শক্তিশালী নেতার অভাবে কোনও দলই আর একদলের সহিত মিশিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইতে স্বীকার করে নাই। এই সব দলের নেতারাই আবার অনেক সময় নিজেদের সামান্য আধিপত্য টুকু বজায় রাখিবার জন্যই ঐরূপ মিলনের বিরোধী ছিলেন। মানুষ সংজে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না আবার তেমন শক্তিশালী পুরুষের নিকট মাথানীচু না করিয়াও থাকিতে পারে না। আবার যখন কোনও অভিনব আদর্শ অথবা বিচিত্র কর্ম্মের প্রেরণায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে তখনও এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অহংকার ও স্বার্থপরতা আর মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে পারে না।

যতীন বাবুর নেতৃত্ব এইরূপ ধরণের ছিল যাহার প্রভাবে বাঙ্গলার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সম্মিলিত হইয়াছিল। ইনি যদিও তেমন বিদ্বান ছিলেন না কিন্তু ইঁহার চরিত্রের প্রভাবে অনেক শিক্ষিত যুবক ইঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহার যেমন সাহস ছিল প্রাণটিও ছিল ঠিক তেমনই উদার। ইঁহার চরিত্রবলের কথা বাঙ্গলার বিপ্লব বাদিদের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু বিভিন্ন দলের এই মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল সেইদিনই যেদিন পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের সংবাদে এক নবীন কর্ম্মের প্রেরণায় তাঁহারা সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এই মিলন ব্যাপারে যতীনবাবুর চরিত্র বড়ই সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে কারণ দলের এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বড় অল্প ছিল না?

এই সব লোকদিগের চরিত্রও সাধারণ লোকদিগের চরিত্রের মত ছিল না, এই সব লোকদিগের মনের উপর আধিপত্য করা বড় কম শক্তির কথা নহে।

ঠিক বলিতে গেলে বাঙ্গলায় এই সময়ের দুইটি মাত্র বিপ্লব দল ছিল। তার একটির নেতা ছিলেন যতীন বাবু। দ্বিতীয় দলকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, একটি বাঙ্গলার বাহিরে কাজ করিতে ছিল অপরটি বাঙ্গলার ভিতরেই নিজেদের কর্ম্মের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গলার বাহিরের সকল কর্ম্মভার রাসবিহারীর উপর ছিল, কিন্তু বাঙ্গলার ভার কোনও একজন ব্যক্তি বিশেষের উপর ছিল না।

এই সময় যাহাতে সারা উত্তর ভারত এক সুরে গাঁথা হইতে পারে সেই জন্য যতীন বাবুকে কাশীতে ডাকা হইয়াছিল। এইরূপে পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসামের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ একযোগে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল। পাঞ্জাবের সিপাহিরা এই সময় কিছু একটা করিয়া ফেলিবার জন্য এমন অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে আর কিছুতেই তাহাদিগকে শান্ত করা যাইতেছিল না। জানিনা এইরূপে তাহাদিগকে সংযত করায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, কারণ আমাদের বাধা নাপাইলে পাঞ্জাবে নিশ্চয় একটা ভীষণ কিছু হইয়া যাইত এবং তার ফল যে কত দূর গড়াইত তাহা কে জানে। আমরা কেবল এই জন্য তাহাদের চাঞ্চল্যে বাধা দিয়াছিলাম যাহাতে সমগ্রদেশ একযোগে বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্যে যোগ দিতে পারে।

যতীন বাবুর কাশী আসা বিষয়ে সরকার বাহাদুর কিছু জানেন কিনা, অথবা জানিলে কতটুকু জানেন তাহা আমার জানা নাই। তবু এখানে এ কথার উল্লেখ কেন করিলাম পাঠককে তাহা জানাইতে চাহি। আমি এপর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে একটিও গোপন কথা প্রকাশ করি নাই; যে সকল ঘটনা নানা যড় যন্ত্র মামলাতে আলোচিত ও আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে এযাবৎ কেবল সেই সব ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছি, এমনকি অনেক এমনও ব্যাপার আছে যাহা সরকার পক্ষ বেশ ভাল করিয়াই জানেন কিন্তু সে সকল ঘটনাও আমি ছাড়িয়া গিয়াছি, কারণ সে সকল ঘটনার সমর্থনযোগ্য উপযুক্ত প্রমাণ এখনও সরকারের নিকট নাই। যে সকল ঘটনা প্রকাশ করিলে কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনাও নাই, অথচ যে সকল ঘটনা সরকার বাহাদুর বেশ ভাল করিয়া জানিলেও দেশবাসী তাহার অতি অস্পষ্ট আভাষ

ছাড়া আর কিছুই জানেন না, সেই সব ঘটনাই আমার ক্ষীণ শক্তি অনুযায়ী বিবৃত করিয়া যাইতেছি। বিগত যুদ্ধের সময় ভারতে যে সকল ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ সময়ই জেলের মধ্যে হইয়াছিল এবং সে সকল মামলার বিবরণ জন সাধারণ প্রায় কিছুই জানে না, কারণ পুলিশ এবং বিচারক-দিগের অমনোনীত কোন সংবাদই, এমন কি যাহা বিচারদিগের সম্মুখে প্রমাণিত ও হইয়াছিল তাহাও প্রকাশিত হইত না, তাই এ সকল ঘটনা অনেকের নিকট একেবারে নূতন ঠেকিতে পারে। আমার কেবল এই বাসনা যে যাহা সরকার জানেন তাহা দেশবাসীও জানুন। যাহা সত্যই দেশে হইয়াছিল, যাহা জানিলে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের বিষয়ও জানা যায়, আচার কোন খানে আমাদের দুর্ব্বলতা ছিল, কোথায় অমরা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছি, কোন খানে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা ও কার্য্যের ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছিল, এ সব ও জানা যায় তাহাই অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া যাইতেছি। ইহাতে আমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছু হইবে না। দেশে বিপ্লবের কিরূপ বিরাট আয়োজন হইয়াছিল তাহা লুকাইবার কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না, বরং আম ইহাই চাই যে দেশবাসী ইহার সবটুকু জানুন। আমার লেখা সম্পূর্ণ হইলে দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন যে বিপ্লবায়োজন জনকতক মুষ্টিমেয় বালক অথবা যুবকদের খেয়াল মাত্রই ছিল না, অথবা ইহার আয়োজনও তেমন অব্যবস্থিতের মত হয় নাই যেমন Rowlatt reoport এ প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল ঘটনা যেমন ভাবে বিকৃত করিলে দমন নীতির সাহায্য হইতে পারে অথচ যাহাতে দেশবাসীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না জন্মায় Rowlatt report কেবল সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই Report এ এমন অনেক কথা আছে যাহা অতিরঞ্জিত কিন্তু সে সব অতিরঞ্জন অতি তুচ্ছ বিষয় হইয়া, এবং সে গুলি এমন ভাবে বর্ণিত আছে যাহাতে দেশবাসীর সম্মুখে বিপ্লববাদিদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। আবার এমন গুরুতর বিষয় ছিল যাহা প্রকাশ করিলে দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইতে পারে তাহা বেমালুম চাপা দেওয়া হইয়াছে। কেমন করিয়া কত কাল ধরিয়া, কত সন্তর্পণে তিলে তিলে কত রত্ন সংগ্রহ করা হইয়াছিল, আবার কত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া, কত অন্তর ও বাহিরের নির্য্যাতনের কষ্টি পাথরে যাচাই হইয়া, কত নীরব বীরত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া এই সব রত্ন দিয়া মালা গাঁথা হইয়াছিল তাহা Rowlatt report পড়িলে জানা যাইবে না, কিন্তু আমার দুঃখ এই যে সে সকল কথা উপযুক্তরূপে

প্রকাশ করিবার মত ক্ষমতা আমারও নাই, কিন্তু যাহা পারি তাহাই করিতেছি।

অনেকে একথাও মনে করেন যে এইরূপে প্রকাশ করিলে (যেন এ সকল কথা এখনও অপ্রকাশিত আছে!) সরকারের তরফ হইতে দমননীতির প্রচলন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, যে বিপ্লববহ্নি একদিন কেবল মাত্র বাঙ্গলার এক প্রান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ ১৬।১৭ বৎসরের দমননীতির ইন্ধন সংযোগে তাহারই অগ্নিশিখা রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশাওয়ার পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাই যাঁহারা এই দমন নীতির মূলোচ্ছেদ করিতে চান তাঁহাদিগকে আমার ব্যক্তব্য এই যে বিগত যুগের বিপ্লব প্রয়াসকে হাস্তাম্পদ ও ছোট করিবার অথবা তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া, তাঁহারা যেন সরকার পক্ষকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন যে দেশের সত্য আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার চেষ্টা করিলে অথবা বৈধ আন্দোলনের বিকাশের সুযোগ ও অবকাশ না দিলে এইরূপে গোপনে প্রলয়াগ্নির উদ্ভব হইবেই। বৈধ প্রকাশ্য আন্দোলনের অপেক্ষা, গোপনে বিপ্লব প্রয়াস যে বড় কম শক্তিশালী তাহা ত মনে হয় না। ইংলণ্ডে এই প্রকাশ্য আন্দোলনের অবকাশ আছে বলিয়াই, আর—সে যতই কেন তীব্র আন্দোলন হউক না,ইংলণ্ডে এইরূপ প্রকাশ্য আন্দোলনে জন্ন সাধারণ বাধা পায় না বলিয়াই ফ্রান্স অথবা ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সেখানে গোপনে বিপ্লবের চেষ্টা অনেক পরিমাণে কম হইয়াছে। দমননীতির দ্বারা মরনোন্মুখ জাতিকেই বশ করা যায়, কিন্তু বিকাশোন্মুখ জাতির আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে কোনও দমন নীতির দ্বারাই ব্যর্থ করা যায় না। এই কথা আজ দেশবাসীর ও সরকার পক্ষের উভয়েরই বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

যতীনবাবু আজ ইহজগতে নাই, তাই তাঁহার কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। এই সময় যে আমরা সারা উত্তর ভারত একযোগে একই উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করিতেছিলাম তাহা হয়ত আমাদের দেশবাসী ভাল করিয়া জানেন না, এমন কি বাঙ্গলার সব বিপ্লবদলও একথা হয়ত নিঃসংশয়রূপে জানেন না। ক্রমশঃ

ডালি।

আইরিশ জাতীয় জীবন।

ও

কবি এ ই—(জর্জ্জ রাসেল)

শ্বেতই হউক আর কৃষ্ণই হউক, দীর্ঘ পরাধীনতার ছাপ সকল জাতির অঙ্গে প্রায় এক আকারে দেখা দেয়। আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বিজেতার অমানুযোচিত অনুকরণ, দাসসুলভ মনোভাব, ভীরুতা, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ একতার অভাব প্রভৃতি কলঙ্ক স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের পর ধীরে ধীরে জাতির মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকে। তাই যখন কোন জাতি জাগিয়া উঠে, অধীনতার পাশ ছিন্ন করিতে উদ্যত হয় তখন প্রথমেই সংগ্রাম বাধিয়া যায় তাহার এই ভিতরকার শত্রুগুলির সহিত। সেইজন্য জগতে যে সকল জাতি পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের ইতিহাস অন্ততঃ এই হিসাবে প্রায় অনুরূপ।

চিন্তাবীর মহাপ্রাণ আইরিশ কবি এ ই জগতের সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম জর্জ্জ রাসেল। তিনি তাঁহার "National Being" নামক পুস্তকে যে ভাবে জাতীয় জীবন গঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন, যে সকল জাতীয় সমস্যার সে ভাবে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বহুদূরে এবং নানা বিভিন্ন অবস্থার ভিতর থাকিলেও তাহা আমাদিগের প্রণিধানযোগ্য। আইরিশ জাতীয় সমস্যা ও আমাদিগের জাতীয় সমস্যার অনেকগুলি মূলতঃ এক। অবশ্য আমাদিগের দেশে কতকগুলি এখনও তেমন তীব্র হইয়া উঠে নাই।

ভিতরকে খর্ব্ব করিয়া বাহিরকে বড় করিবার চেষ্টায় মানুষকেই পরিণামে ঠকিতেই হয়। বাহিরের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য যখন ভিতরের মহত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া না পড়ে তখন তাহার স্থায়িত্বের সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে। বাহিরের শুষ্ক আচারকাণ্ড ভিতরের প্রাণকে প্রকৃত ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। যখন ভিতরের প্রাণের প্রেরণাই বাহিরে আচাররূপে ফুটিয়া উঠে তখনই সে আচার অর্থবান ও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে এ কথা যেমন সত্য জাতির দিক দিয়াও ঠিক তেমান সত্য। সেই জন্য রাসেল এই গোড়ার কথাটিকে প্রথমে বিশেষ ভাবে ধরিয়াছেন। তাঁহার

ব্যক্তিকে লইয়া জাতি গঠিত সেই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে জাতির সভ্যতার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। দেশের ভিতরে প্রাণকে সুন্দর ও মহৎ করিতে পারিলে তবেই দেশ বাহিরেও শোভন ও সম্মানীয় হইবে। জাতির ভিতরকে বড় না করিয়া বাহিরকে বড় করিবার চেষ্টা সফল হয় না। উত্তেজনার আধিক্যে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও যাহার মাথা তাহার তাহা চাইই; নতুবা হয় না। ইহাই জগতের নিয়ম।

জাতীয় জীবন গঠনের প্রথম কথাই হইতেছে জাতিপ্রকৃতি ও বিশিষ্টতার সহিত পরিচিত হওয়া ও সেই অনুযায়ী গঠন কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া। জাতির প্রকৃতি ও জাতীয় বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দেশের সকল সমস্যার মীমাংসা করা উচিত; নচেৎ অকৃতকার্য্যতার বোঝাই বহিতে হইবে।

জর্জ রাসেল বলিতেছেন কেবল মাত্র নিজের জন্যই রাশীকৃত অর্থ আহরণের চেষ্টা করিলে, সে যে শুধু ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘন করিবে তাহা নহে, আইরিস সমাজ ও জাতি প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, কারণ চিন্তা চারিত্রিক আভিজাত্য এবং অর্থ নৈতিক সাম্য ও একাকারই হইতেছে আইরিস জাতীয় জীবনের মূল। আইরিস সভ্যতা এই দুইটীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে; নচেৎ স্পেন, ও পর্টুগাল প্রভৃতির ন্যায় সভ্যতা ও স্বাধীনতার কেবল আবরণটিকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। জাতির পক্ষে তাহা স্বাভাবিক ও প্রাণের জিনিস হইয়া উঠিবে না।

এই জাতীয় ভাব, এই জাতীয় জীবন একটা বিশেষ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে। এই কার্য্য প্রণালী নানাদেশে নানা আকারে দেখা দেয়। রাসেলের মতে ইউরোপের নানাদেশে এই জাতীয়ত্ব সমর তন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্র সমরতন্ত্রতার দ্বারা আপন আপন দেশের জাতীয়ত্বকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু রাসেল এইভাবে আয়ারলণ্ডের জাতীয় ভাবকে রক্ষা করিতে বা ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন না। সমর তন্ত্রতা জাতিকে শৃঙ্খলা ও একতা শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু জাতির মন হইতে অনেক মহৎ ভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া আয়ারলণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সমরতন্ত্রতা বিশেষ ফলপ্রদ নীতি নহে। যুদ্ধের সময় বেলজিয়ামই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। "Our geographical position and the slender population of our country make it evident that the utmost force which Ireland could organise would

make but a feeble barrier against assault by any of the greater States." এমন একটি নীতিকে ধরিয়া জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইবে যাহা শত্রুর পাশব আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিতে পারিবে না। রাসেলের মতে সে নীতি হইতেছে সমবায় (co-operative) নীতি। এই নীতির উপর আইরিস জাতীয়ত্বকে দাঁড় করাইলে জাতির মধ্যে এমন একটি একতা ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে যাহা শত্রুর শারীরিক বলের সর্ম্পূর্ণ অজেয়। সেইজন্য রাসেল-বলিতেছেন যে জগতের অন্যান্য দেশে বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষা বা military conscription প্রচলিত আছে, আমরা সেইরূপ civil conscription এর দ্বারা দেশের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিব। মানুষ মারিবার জন্য যদি দেশের যুবকবৃন্দ জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই চারি বৎসর দান করিতে পারে, তবে এইভাবে দেশকে প্রকৃত স্বাধীন করিবার জন্য কেননা দান করিবে ?

একস্থলে রাসেল বলিতেছেন—অন্যান্য রাষ্ট্র যদি প্রাণ: সংহারের জন্য দেশের যুবকদিগের সহায়তা লাভ করিতে পারে, আয়ারলণ্ড তাহা হইলে প্রাণ রক্ষার জন্য, জাতীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার জন্য কেননা সে সহায়তা লাভ করিবে ? সাধারণ (public) অট্টালিকা নির্ম্মাণ, পতিত জমির উদ্ধার সাধন অরণ্য রক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বজন হিতকর শ্রমসাধ্য কর্ম্মের দেশের তরুণের দল কি জীবনের দুই বৎসরও দান করিতে পারিবে না ?

বর্ত্তমান সভ্যতায় অর্থ নৈতিক সাম্য বা Democracy in Economics প্রায় একরূপ অসম্ভব। তাই রাসেল বর্ত্তমান সভ্যতার উপরই খড়্গহস্ত। বর্ত্তমান সভ্যতার এই সর্ব্বনাশকর কলকারখানা পল্লী সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পল্লী ও নগরের অর্থ নৈতিক ও প্রতিযোগিতা সকলকেই তিনি মানব সভ্যতার পরিপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন বর্ত্তমান শ্রমিকের যে অবস্থা, তাহাতে তাহাকে দাস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যে দাস তাহার মনে স্বাধীনতার স্থান কোথায় ? দাসত্ব প্রথা সমাজে লুপ্ত হয় নাই কেবল রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। গুপ্ত দাসত্ব জাতির স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে একেবারে শেষ করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে ভাল মন্দ যাহাই হউক না কেন দাসকে একজন প্রভুর অধীনে থাকিতে হইত; এখন উন্নতি এই হইয়াছে যে সে এক প্রভুর নিকট হইতে আর এক প্রভুর নিকট যাইতে পারে। কিন্তু দাসত্বের তাঁহার আর পরিবর্ত্তন নাই। দেশের সংখ্যাতীত লোককে এইভাবে দাস করিয়া রাখিয়া, তাহাদিগের আত্মাকে সর্ব্ব বিষয়ে

খর্ব্ব করিয়া যে সভ্যতার নির্ম্মাণ হয় তাহা বালুর উপর নির্ম্মিত প্রাসাদের মতই পতনশীল। বাহিরের ঐশ্বর্য্য সেইজন্ত হঠাৎ একদিন ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। সেইজন্ত রাসেল বলিতেছেন "আমাদের যেন এ ভুল না হয়। এইভুলে জগতে বড় বড় সভ্যতার পতন হইয়াছে। আমাদের সভ্যতা হইবে সমাজের দীনতম হীনতম অংশকেও লইয়া, কাহাকেও ছাড়িয়া নহে, কাহাকেও দূরে রাখিয়া নহে, সকলকে লইয়া আমাদিগকে উঠিতে হইবে।" জগতে অনেক প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ধ্বংসপ্রায় সভ্যতাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সে সকল সভ্যতা নির্ম্মিত হইয়াছিল যাহাদিগের রক্তে তাহারাই ছিল প্রধানতঃ ইহা হইতে বঞ্চিত। সেই জন্ত এই যুগ যুগ সঞ্চিত অন্যায়ের বোঝা হইয়া সেই সকল সভ্যতার হটাৎ এক দিন ভরাডুবি হইয়া ছিল।

এখন কথা হইতেছে, সমাজের সকলকে লইয়া যে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইবে তাহা কি রূপ? বর্ত্তমান নগরকেন্দ্র সভ্যতাকে অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া যে সভ্যতার সৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যে প্রকৃত Democracy বা গণতন্ত্রের স্থান নাই। তাই রাসেল বলিতেছেন যে সমবায় (Cooperative) নীতিতে পল্লী সভ্যতার পুনঃ প্রতিষ্ঠাতেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কারণ তাঁহার মতে "The farmer's industry, if we consider it closely is the most democratic of any in its application to society" রাসেলের মতে এই নাগরিক সভ্যতাই বর্ত্তমান সময়ে সকল জাতির পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দুঃখের হেতুই হইতেছে এই সভ্যতা। "Our civilisations are a nightmare, a bad dream they grow meaner and meaner as they grow more urbanised" আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। সভ্যতা পল্লী হইতে যতই নাগরিক হইয়া উঠিতেছে ততই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। তাই এখন পল্লী সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকে তিনি জগতের একটি মহত্তম কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুধু আয়ারলণ্ড কেন জগতের সমক্ষেই আজ এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কেবলমাত্র শ্রমিকের পরিশ্রম বাড়াইয়া বা কাজের সময় কমাইয়া বা লাভের সামান্ত কিছু অংশ দিয়া আর ধণিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধকে প্রকৃত গণতন্ত্র অনুযায়ী করা চলিবে না। এ সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। "the creation of a rural civilisation is the greatest need of our times."

বর্ত্তমান সভ্যতাকে পল্লীমুখীন করিতে হইলে সংস্কারককে প্রথমেই পল্লী-সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পল্লী-সমাজের স্থাপনা ব্যতীত পল্লীসভ্যতার কল্পনাও করা চলে না। এই সমাজের ক্রয় বিক্রয়, আমদানী রপ্তানী, উৎপাদন সকলই সমবায় নীতিতে পরিচালিত হইবে। রাসেল বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র সমবায় নীতির দ্বারাই প্রাচীন সমাজের সেই একতা পরস্পরের প্রতি সদ্ইচ্ছা ও সহানুভূতি ও একাত্মবোধ ফিরাইয়া আনা সম্ভব। সমাজটিকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে সেই খানেই লোকের আধ্যাত্মিক, মানসিক, ও সামাজিক সকল ইচ্ছারই তৃপ্তি হয়। পল্লীতে বাস করিয়া তাহার প্রাণ যেন হাঁফাইয়া না উঠে। পল্লী সমাজকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে তাহাকে পরিত্যাগ করা যেন বেদনাজনক হইয়া পড়ে। এই ভাবে পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠার পর যে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য পল্লীতে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। "The fight now is not to bring back to the land but to keep those who are on the land contented, happy and prosperous. And we must begin orginising them to defend what is left to them, to take, industry by industry, what was stolen from them." সহর হইতে পল্লীতে ফিরাইয়া আনা প্রথম যতদুর হউক আর নাই হউক যাহারা পল্লীতে অছে তাহারা যাহাতে পেটে ভাত মুখে হাসি লইয়া পল্লীতে থাকিতে পারে তাহাই দেখিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাসেলের মতে অর্থ নৈতিক ব্যাপারে যেমন সাম্য আবশ্যক নেতৃত্বে বা পরিচালনে তেমনি আভিজাত্যের প্রয়োজন। এ আভিজাত্য জন্মগত আভিজাত্য নহে; এ চিন্তা, চরিত্র, এক কথায় মনুষ্যত্বের আভিজাত্য। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এ অপূর্ব্ব আভিজাত্যের আবশ্যক, ইউরোপের অনেক দেশই বিশেষতঃ ইংলণ্ড সে ক্ষেত্রে একাকারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। সেই জন্য দেশের রাষ্ট্রশক্তি অনেক সময়ই অযোগ্য লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার democracy র প্রভাবে দেশের সাহিত্য ও যে কিরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছে রাসেল তাহাও দেখাইতে ভুলেন নাই। এই democratic সাহিত্য দেশের সম্মুখে মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ফলে হইতেছে 'Failing any fingerpost in literature pointing to true greatness our democracies too often take the huckster from his stall, the drunkard from his pot, the lawyer from his court, and the

promoter from the director's chair, and elect them as representative men." অর্থাৎ সাহিত্য কোন জীবন্ত মহৎ চরিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়, আমরা যে সে লোককে এমন কি মাতালকে পর্য্যন্ত তাহার পান পাত্র হইতে টানিয়া আনিয়া আমাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে লজ্জিত হই না।

আয়রলণ্ডের কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতি বিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতির হীনতম, দরিদ্রতম ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত রাসেল এই গঠন কার্য্যে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছেন। কাহাকে ঘৃণা করিয়া নহে, কাহারও মুখ চাহিয়া নহে, আপন শক্তিতে এই গঠন কার্য্য চালাইতে হইবে। ঘৃণা ও ক্রোধের দ্বারা গোড়ায় কিছু কাজ হইতে পারে বটে কিন্তু পরিণামে এই ঘৃণা ও ক্রোধের বস্তু নিজেদের ম ধ্যই গজাইয়া উঠিতে থাকে। "Race hatred is the cheapest and basest of all possions and it is the nature of love, to change us into the likeness of that which we contemplate." কিন্তু রাসেল জাতীয়তাকে স্বর্গীয় ভাবে দেখিতে চান। ঘৃণার দ্বারা পুষ্ট এবং জাতি বিদ্বেষের দ্বারা উদ্ভূত যে জাতীয়তা তাহাকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন না। যে জাতীয়তা মানবকে মহৎ না করিয়া তাহার মহত্বের এক কণা ও নষ্ট করিতে চায় তাহাকে তিনি গ্রহন করিবেন কি করিয়া? এ বিষয়ে তাহার শেষ কথা হইতেছে যে মানুষ যদি জগদীশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে, জগৎ তাহা হইলে স্বর্গের প্রতিকৃতি হইয়া উঠিবে না কেন? আমাদিগের সভ্যতা, আমাদিগের জাতিপ্রেম এই কার্য্যে সানন্দে যোগ না দিয়া বিরোধী হইয়া উঠিবে কেন?

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ

সাধনা ও সিদ্ধি

[আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়]

আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ করতে হবে—শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহামতি গোখলে বলেছেন—What Bengal thinks to-day,

the whole of India thinks to-morrow—বাঙালীর মস্তিকপ্রসূত চিন্তা সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্কচালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে' গণ্য হ'য়ে এসেছে—বাঙলার কোলে অনেক ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, সুলেখক, বৈজ্ঞানিক দেশবিশ্রুত বাগ্মী, জন্মগ্রহণ করেছেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন দিক্‌পাল বাঙলার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান্ হয়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, :তার চরিত্রের গলদ কোথায় ; অন্তরের কোন্ বাধাটা তার চলার পথে পথে আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে।

সক্রেটিস্ বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে—যাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের আশা—আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা ; —আমি বলি 'ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" অপ্রিয় সত্য বল্‌তে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি নিবেদন করে' খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্ন স্থান লুকিয়ে রাখ্‌লে দুর্গ-প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ঢাক্‌লে অভাব ঘোচে না ; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয় ;—আর তার জন্যে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর বক্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথাগুলি এই, যে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্যসহকারে তিনি মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৭০০ জন সরকারের চাক্‌রী করেছেন, তারও অধিক ইস্কুল মাষ্টার হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন ডাক্তার হ'য়ে বাহির হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুমেয়। মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ জীবনের একটানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞানজগতে নব নব পথের সন্ধানে বের হন নি। আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্ব্বোতোভাবে প্রযুজ্য। বাঙ্গলা দেশেও ঐ—একই দশা—কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদ্গিরণ, পরীক্ষাপাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ,

তারপর মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্ আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মাদ্রাজী গ্রাজুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হ'য়ে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধা ওই চাকরীর ঘানীতে আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছে—"মা আমায় ঘুরাবি কত—কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।"

আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন কর্‌বার শক্তি মাদ্রাজের চেয়ে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে কল্‌কাতা সবার অগ্রণী—কিন্তু হেসো না; এ-সব ঘরের কথা বাইরে না যায়। অসহযোগ; সহযোগ স্বীকার করি না; এবার ২০;০০০ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন পাশ হবে। কিন্তু একজন উপাধিধারী কি প্রকার কূপমণ্ডূক তা চিন্তা কর্‌লে মন বিষাদিত হয়। বর্ত্তমান প্রথানুসারে একজন এম-এসসি কিম্বা এম-এ'র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাক্‌লেও চলতে পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কলন; ফ্রাঙ্ক্‌লিন প্রভৃতির নাম শোনেন নি এমন গ্রাজুয়েটও অনেক আছেন। ভূগোল চাই না; ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না,—শুধু পাশ করে' যাও—মাট্রিক, আই-এ, বি-এ, ফাষ্টক্লাস, সরেস এম্-এ। উচ্চশিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাট্‌সিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারীবাল্‌ডিকেও হয়ত মস্ত একটি বীর ব'লে জানেন কিন্তু কাবুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুল্‌কাতে আরম্ভ করবেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকায় অন্তর্বিবাদ (Civil War) কেন হ'ল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কলন জ্যাকসন কে, কোন পক্ষ জয়ী হ'ল, বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোক্‌সান কি হ'ল? তাহলেই ফিলসফির ফাষ্টক্লাস এম্-এ একবারে অবাক হ'য়ে হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌বেন;—এ-সব আবার কি? প্রফেসারের কোনো নোটে ত এ-সব লাল নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কস্মিন কালে পাঠ করি নি।

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গতবৎসর এই সময় আমি দেশে ফিরে আসি। সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্মিংহাম্, লীড্‌স্, এডিন্‌বরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। অনেকস্থলে এক একটা কলেজ এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা বিদ্যানুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে আর প্রত্যেক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা কর্‌ছেন। আর পর পর এমন বড়লোক ঐ সকল বিদ্যামন্দির থেকে বাহির হ'য়ে আসছেন, যা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। এঁদের অনেকে

একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার নেশায় ভরপুর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে' দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একের শূন্যস্থান অপরে পূরণ করছেন। আর এই-সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি! একখানা "নেচার্" তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান খুলে য়ুরোপে অনুশীলিত কত রকম বিদ্যার কত রকম রোজনাম্চা যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেখানে কতশত অনুসন্ধান-সমিতি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতিতে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত পরিপুষ্ট করছে। এই ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে,, যে তার আর শেষ নেই। কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা ঐ-সব দেশে বিদ্যার্থিগণের তথা জন-সাধারণের চিত্তবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে' রেখে দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর, আসীরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনযাপন করেছিল সেই-সকল প্রত্নতত্ত্বের বিচারের ফলে য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ জ্ঞান-রাজ্যের এক একটা নূতন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যার নাম হয়েছে—ইজিপ্‌টলজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি। লেয়ার্ড, রলিন্‌সন, পেত্রি (Layard, Rawlinsoh, Petrie) প্রভৃতি এই-সকস বিদ্যার হোতা।

তারপর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা যাক্। জাপানে তোকিও, কোবে, কিয়োতো, প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বাংশে য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সেবার বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুই শত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া সবাই কেমন করে ফাঁকি দিয়ে একটা বিলাতি সস্তা ডিগ্রি এনে দেশী ডিগ্রির উপর টেক্কা দিবেন সমস্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ করছিলেন। আমাদের দেশের যে-সব ছাত্র মাট্রিক বা আই-এ, আই-এসসি প্রভৃতি পাশ করে' বিলাত চলে' যায়, দেখ্‌তে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের চিন্তা কি করে শীঘ্র একটা বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশবাসীর চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ কর্‌বার পর য়ুরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে' সেই বিষয়টিই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে মাটী বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ

হ'য়ে বিলাত যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটে তা বল্‌ছি না। এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ ক'রে বৃদ্ধি পেয়েছে! কেহই যে কিছু দেন নি এমন কথা বল্‌ছি না। ব্যতিক্রম ত আছেই কিন্তু তাঁদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা কে বুঝবার চেষ্টা করে—কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার যথার্থ সম্মান কর্‌তে পারে? এখানে যে সব ছাত্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরী কর্‌ছেন! কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে পার্‌লেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। আপন রোজগারের প্রধান অংশ পুরাতন পার্‌সী পুঁথি ক্রয় কর্‌তে ব্যয় করেছেন, পাটনা খোদাবক্‌স্ লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ Authority বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তার উপর আর কেউ কথা বলতে পারেন না, এদেশেও নয়; য়ুরোপেও নয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এর পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধন।

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী—তাঁরা গ্রাজুয়েট হ'লেই প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাক্‌রী দিতেন। এই সময় থেকে মতিগতি যে চাকরীর দিকে গেল সে আর ফির্‌লো না। বাঙ্‌লার ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হ'ল, আর বাঙ্‌লার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। সাধনা—ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি—চাকরী!

এইরূপে আদর্শ খাটো হ'য়ে গেল। তাই গভীর জ্ঞান-সাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক থাকুতে শিখ্‌লেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল এক প্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে; ইতিহাসও না পড়্‌লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এম্‌-এ, এম-এস্‌সিগণ অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত।

ক্যালেণ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অক্সফোর্ড, কেম্বিজ, হারভার্ডকেও ছাড়িয়ে যায়।

তাই বলি সর্ব্বনাশ হয়েছে এই ভাদা-ভাদা জ্ঞানে, আর অতি সস্তা পাশে। ফিস্‌ক্যাল-কমিশনের স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনশ্যামদাস বিরলা প্রভৃতি বস্‌বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে যাদের নাম জলজল কর্‌ছে সেই (Cobden Medallist) স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাঙালী যুবক ত ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আলোচনায় আহুত হলেন না। স্যার বিঠলদাস ঠাকর্‌সে বড় বড় কলের মালিক—পরন্তু "গোল্ড মেডেলিষ্ট" নন। টাকা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করেন বলে মহামতি গোখ্‌লে বজেট-বক্তৃতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞানে গ্রহণ কর্‌তেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে-কার্‌বার-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যাঁর মতামত বহুমূল্য বলে বিবেচিত হয় তিনি হচ্ছেন ডিগ্রীহীন সাতকড়ি ঘোষ। চিন্তামণি, কালীনাথ রায় প্রমুখ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ অনেকেই ডিগ্রীশূন্য; কিন্তু এঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে সব মূল্যবান কথা লেখেন, বড় বড় ডিগ্রীধারিগণ তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ কর্‌তে পারেন।

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলে গর্ব্ব করে' থাকি আর য়ুরোপীয়দের জড়বাদী বলে গালি দিই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থানে স্থানে নানা কুষ্ঠালয়, হাস্‌পাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে। ভারতবর্ষে ৭২টি কুষ্ঠালয় আছে, তন্মধ্যে দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি ছাড়া আর সবই তো ওদের। ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবনই তো কুষ্ঠীর সেবায় তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন! আর্ত্তকে কেউ কোলে তুলে নিচ্ছে আবার কেউবা বলছে—ওকে ছুঁয়ো না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে জান্‌বার বুঝ্‌বার, পাবার কি দুর্ণিবার চেষ্টা! কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ কর্‌বার জন্যে বৎসরের-পর বৎসর চেষ্টা কর্‌ছেন, তার আয়োজনই বা কত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের কিলিমেন্‌জেরো পর্ব্বতের চিরতুহিনাচ্ছন্ন চূড়ায় কোন চিরনূতনকে দেখ্‌বার প্রয়াস কর্‌ছেন! সু-উচ্চ গিরিদেশে শ্বাসরোধ হয়ে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে—তবু দৃক্‌পাত নেই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। মেরুসান্নিহিত প্রদেশে প্রাকৃতিক অবস্থা জানবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন, ন্যানসেন শ্যাক্‌ল্‌টন প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এরা কর্‌বে, আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা কর্‌বে। কি

বিপুল দুর্দ্দান্ত জীবন! উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ইংরেজ হুকার বিচিত্র লতাগুল্মের সন্ধানে সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধ-জয়ের পর তিনি মুক্ত হলেন। তাঁর Flora Indica বর্ণিত সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে (Kew Garden) কত যত্নে রক্ষিত হয়েছে। আবার পশুতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয়ান সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদসঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচায় মধ্যে বাস করে মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য গরিলা সিম্‌পাঞ্জী প্রভৃতি বনমানুষের অভ্যাস ও আচরণ জান্‌বেন; তাদের ত ভাষা নেই, তাই সঙ্কেতে তাদের ভাববিনিময় লক্ষ্য কর্‌বেন। এমন অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারেই তাঁরা সত্যের আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় টাইকো ব্রেহী কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেলের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর! এত গভীরতা শোণিতসম্পর্কে কোথায় পাবে! গ্যালিলিও কেপ্‌লার সমসাময়িক ছিলেন। কেপ্‌লারের অভাবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম হত না। কত বিনিদ্র রজনীতে উদার উন্মুক্ত অসীম আকাশের দিকে কি আনন্দে কি আশায় এঁরা চেয়ে থাক্‌তেন! কি অমূল্য রত্ন এঁরা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে দিয়ে গেছেন। এঁদের জ্ঞান-সাধনার মূলে গভীর অভিনিবেশ! একবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে এঁরা সাধ্য বস্তুর সন্ধান করেছিলেন, তাই সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। রেনেসাঁস যুগে প্যারিস নগরে হোমারভক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালিগার আপন ঘরে পাঠে নিমগ্ন; এদিকে বাহিরে হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল (Massacre of St. Bertholomew); কত প্রোটেষ্টাণ্টকে খুন করা হ'ল, কিন্তু তিনি এমনই তন্ময় যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার পরদিন জান্‌লেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুক্ত হ'য়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা কর্‌তেন, তবেই তরুরূহ তত্ত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। প্লেতো তাঁর শিষ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুদিয়স্‌এর বিবাহদিনে গির্জায় কনে এসেছেন, অন্যান্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায়? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বরকে পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন আছেন। যাঁর বিয়ে তার মনে নাই। রোমান্ সৈন্য যখন আর্কিমিসিকে খুন কর্‌তে এসেছে তখন আর্কিমিডিস বল্‌লেন—দাঁড়াও একটু, এ বৃত্তটা নষ্ট ক'রে দিও না, এ প্রমাণটা শেষ করি। বর্ব্বর সৈন্য তাঁকে খুন ক'রে জগতে মহৎ সত্য উদ্‌ঘাটনের পথ হয়ত রুদ্ধ ক'রে

দিয়ে গেল। এমনই ক'রে আপনহারা হ'য়ে সাধনা না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে?

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতির কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন 'জনহিতায়' ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য। জ্ঞানসাধকের সাধনলব্ধ যা-কিছু তা পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রেই আমরা হ'টে গিয়ে পিছনে প'ড়ে গেছি। সর্ব্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বল্‌তেন "জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙ্গালী অতি বুদ্ধিমান।" সেইজন্যই বাঙালী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব। ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, অর্থসমস্যা প্রভৃতি নানা-সমস্যায় প'ড়ে আমরা সব রকমে মাটি হ'য়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে প'ড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আর বাঁচ্‌বার আশা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে চেষ্টামাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে তা কখনই নয়। সুতরাং কাজ আরম্ভ ক'রেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চলবে না! মনে রাখ্‌তে হবে, প্রয়াসসাধ্য সকল কার্য্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ়রহস্য যারা উদ্‌ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টার আনন্দে আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জর্ম্মান দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বল্‌তেন—তুমি সত্য চাও না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন—আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই খোঁজের খেয়াল বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হ'য়ে থাকৃতে চাই। এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে। আর এই অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।

ধর্ম্মজগতে বুদ্ধ, যীশু, মোহম্মদ, চৈতন্য—এদেরসিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত একই।

জনকোলাহলের বাহিরে পর্ব্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা ক'রে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য সিদ্ধার্থ; আমরা অতীতের গর্ব্ব করে থাকি, কিন্তু অতীতের প্রাণের লক্ষণ-গুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই না ;—অতীতের সিদ্ধির উপর আমাদের লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে' যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শত-দলপদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে' এইশতদল ফুটেছে,—এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোখলে ইস্কুলমাষ্টার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫৲ টাকা মাহিনায় গোখলে ফার্গুসন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্ত গোখলে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্যব্রতধারীর বজেট-বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সভায় লাট কর্জ্জন কাপ্‌তেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে' আমার কথা শেষ করি ;—তিনিও দারিদ্র্যব্রতধারী, মহাসাধক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে? ২১ বৎসর পূর্ব্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গান্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ কলোনিতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ দুর্দ্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা। তিনি দেশবাসীর হিতের জন্য আপনাকে একবারে নিঃশেষ করে' উৎসর্গ করে' দিয়েছিলেন। নেটাল প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্য ভাবে নিগৃহীত নিপীড়িত ও অত্যাচরিত হয়েছিলেন। মাসে ৫।৬ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে' সবার ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার করতে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭।২৮ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী-প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

প্রবাসী—

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(চতুর্থ গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

(ছায়া)

কীর্ত্তন——একতালা।

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমিত তাহারে পাব না।
আজি তবু তারে স্মরি', সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী ;
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে, সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায় সে আকাশ ছাপিয়া ;
দেখি, শুনি' সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া ;
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে ;
কেন—রহি' এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো ;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো,
—নানা, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে ;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে॥

[স্বরলিপি—শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা]

আরম্ভ, ঠা, লয়ে—

		০				১				২´			
মমা	II {	মঃ পাঃ	পা	।	পা	ধা	পা	I	মঃ	মাঃ	মা	।
আর্		কে ন	মি ছে			আ	শা		মি	ছে	ভা	

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি 'নারায়ণে'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

৩ ০ ১
। গমপা মা গা। সঃ মাঃ মা। মা গমগমা -পা I
ল•• বা সা মি ছে কে ন তা••• র্

২´ ৩ ৩
I গ গা -পা -মপা। (গা -া মমা)}। গা -া প ধা
ভাব ০ •• না • 'আর্' না • সে যে

০ ১ ২´
। { র্সঃ র্সাঃ র্সা। -া র্সঃ র্সাঃ I র্সঃ সাঃ র্স র্সা।
সা গ রে র্ ম ণি আ কা শের্

৩ ০ ১
। নর্সর্রা -না -া। না র্সা না। ধা পা মগা I
চাঁ•• ০ দ্ আ মি ত তা হা রে০

২´ ৩ ৩
I গঃ মাঃ পধনর্সা। (-ধঃ -নাঃ প ধা)} ।-ধঃ -নাঃ মমা II
পা ব না•••• • • সে যে • ০ "আর্"

০ ১ ২´
II { পঃ ধাধঃ নর্সনা। -নর্সনধপা ধধঃ ধাঃ I র্সর্সা র্সনা -ধনধনর্সা
ত বু তা রে•• ••••• ম্ম রি সত ত০ •••••

৩ ০ ১
। না ধা পা। র্সঃ র্সাঃ র্সর্সা। -র্রা সা র্সর্নধা
শি হ রি কে ন আমি • হ ত••

২´ ৩ ৩
I ধনা -ধনসা-র্সর্সা। (-া -া র্পর্পা)}। -া র্সঃ র্সর্সাঃ।
ভা০ ••• গিনী ০ ০ আজি • কে নএ

০ ১ ২´
। { র্সঃ র্সা -া -র্রঃ। র্রঃ র্রা -া -০। র্সর্সা র্রর্গর্মর্পা -র্মা।
প্রা ণে • ব্ মা ঝে • • নিশি দি••• ন্

০ ০ ১
। র্মর্মা -র্গর্রা র্সা । র্সর্স র্সর্না ধপা । মমা গা -া
বাজে • • • সেই এ• • ক্ মধু রা • I

২ ৩ ৩
I গঃ মাঃ পধনর্সা । (-ধঃ -নাঃ র্সর্সা)} । -ধঃ -নাঃ মমা II
রা গি ণী••• ০ • কেন এ • ০ "আর্"

০ ১
II মঃ পাঃ পা । পা ধা পা I
কে ন মি ছে আ শা

আরম্ভের লয়ের দ্বিতীয় দ্রুত লয়েঃ—

২ ৩ ০
I {মা পা পা । পা পা -া । মা মপা ধা
উ ঠে সে ই গা ন্ নী র• ব

১ ২ ৩
। মা গা -মা I পা -া পা । পা পা——মা ।
ম হা ন্ যা য় সে আ কা শ্

০ ১ ১
। পা ধা পধা । (-নর্সা -ধনা মমা)} I -নর্সা -ধনা পধা I
ছা পি য়া• •• •• শুনি •• •• দেখি

২ ৩ ০
I {র্সা র্সা র্সা । সা র্সর্স র্সা । র্সা র্সা র্সর্রর্গা ।
শু নি সে ই ধ্ব নি শি হ রে•••

১ ২ ৩
। র্রা র্সা না I ধা র্সা না । ধা পা মগা ।
ধ র ণী তা রা কু ল্ উ ঠে•

০ ১ ১
। গা মা পধনর্সা । (-ধঃ নাঃ পধা)} I -ধঃ -নাঃ -া I
কাঁ পি য়া••• • ০ দেখি ০ • -া I

২ ৩ ০
I -া -া । -া -া ম মা । {পঃধা ধঃ নর্সনা ।
• ০ ০ • আমি চেয়ে থা কি••

১ ২´ ৩
। -নর্সনধপধা ধা -া I র্সর্সা র্সনা -ধনধনর্সা। না ধা -পা।
০০০:০০ স্থি র্ নী র ব০ ০০০০০ গ ভী র্

০ ১ ২´
। র্সঃর্স র্সঃ র্সা । -র্রা র্সা -র্সধা I ধনা -ধনর্সা র্সর্সা।
নির্ ম ল ০ নী ০ল০ নি০ ০০০ শীথে

৩ ৩ ০
। (-া -া পপা) } । -া -া র্সর্সা । {র্সঃ র্সা -র্সর্রা।
০ ০ আমি ০ ০ কেন র হি ০ ০

১ ২´ ৩
। র্রা র্রঃ র্রাঃ I র্সর্স র্রর্গর্মর্পা র্মা । র্মর্মা -র্গর্রা -র্সা।
এ মহী তে অসী ম০০০ হ। ইতে ০ ০ -র্সা।

০ ১ ২´
। র্সর্সা র্সনা -ধপা । মমা গা -া I গঃ মাঃ পধনর্সা।
চ.হি সে০ ০০। অসী মে ০ মি শি তে০০০

৩ ৩ ০
। (-ধঃ -নাঃ র্সর্সা)} । -ধঃ -নাঃ মমা । মঃ পাঃ মি
০ ০ কেন ০ ০ "আর"। কে ন মি

১
। পা ধা পা I
ছে আ শা

আরম্ভের লয়ের দ্বিগুণ দ্রুত লয়ে :—

২´ ৩ ০ ১
I {মা পা পা । পা পা -া । মা মপা -ধা । মা গা -মা I
পা রি না ত হা য় ধূ লা০ য়। গ ড়া -য়

২´ ৩ ০ ১
I পা -া পা । পা -া মমা। ধা ধা পধা । (-নর্সা -ধনা মমা)} I
ত প্ ত অ ০ শ্র বা রি গো০ ০০ -০০ আমি

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২৯

দেশের কথা*

[শ্রীবাসন্তী দেবী]

আজ আপনাদের সাদর আহ্বানে আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া সুখ দুঃখের কয়েকটি কথা বলিতে এবং শুনিতে আসিয়াছি। আমি জানি, যে আসন আপনারা আমাকে দিয়াছেন তাহার যোগ্য আমি নহি—কিন্তু বাল্য-স্মৃতি-বিজড়িত এই আসামপ্রদেশ আমার কাছে চির-মধুময়। বহুকাল পরে জীবনের মধ্যাহ্নে যখন সেই প্রদেশের ভগিনীদিগের নিকট হইতে স্নেহের ডাক আসিল তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই প্রাণের স্নেহ-রসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মায়ের আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই পাওয়া যায়। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই আমার ডাক আসিয়াছে। মা আমাকেও ডাকিয়াছেন আপনাদেরও ডাকিয়াছেন—মিলনের জন্য। এই প্রাণ-যজ্ঞের হোমানল-শিখায় মিলনের বাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠুক।

ইতিহাসে জাতির প্রাণধর্ম্মের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় জানি। আজ আমরা সকলে যে প্রদেশে সমবেত হইয়াছি—কত ইতিহাস তাহার আছে, কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত অমানিশার কাহিনী ইহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে! কামরূপে চিরকাল হিন্দুর জ্ঞানগরিমা উজ্জ্বল রহিয়াছে। অনার্য্য

---

* আসাম মহিলা সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য লিখিত অভিভাষণ। সরকারের চণ্ডনীতির কল্যাণে আমাদের কর্ম্মিগণ ধৃত হওয়ায় সভার অধিবেশন হয় নাই।

আহোম জাতি অমিতবলশালী কোচনরপতিগণকে পরাজিত করিয়া সমস্ত আসামদেশে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিল বটে, কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষের অতি পুরাতন, আবহমানকাল প্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম ও জ্ঞান বিজেতা আহোম-জাতিকে পরাস্ত করিল—অর্থাৎ তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে! পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। বিজেতৃগণ বিজিতগণের ধর্ম্ম জ্ঞান আচার পদ্ধতি ও রীতি-নীতি গ্রহণ করিয়া তদ্দেশীয় লোকের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। তাই মনে হয় ভারতের ইতিহাসে আসামকে যাদুকরের দেশ বৃথা বলা হয় নাই।

কিন্তু ইতিহাস আলোচনার অবসর এখন আমাদের নাই। যে ভারতভূমি একদিন ধনধান্যে, জ্ঞানগরিমায়, শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলনীয়া ছিলেন, আজ সেই ভারতবর্ষ শ্মশান, গাঢ়তর অন্ধকার—দিবসে নিশীথপ্রায়। আজ আমাদের পেটে অন্ন নাই, কটীতে বস্ত্র নাই! একদিন যে ভারত জগতের বিলাস-সম্ভার যোগাইত আজ সেই ভারত নিজগৃহে পরান্নভোজী, চির-পরবাসী—জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে না-বাঁচা না-মরা হইয়া আছে! অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! সেই সমৃদ্ধি আমাদের আর নাই, কিন্তু স্মৃতির জ্বালা আছে। সেই স্মৃতির পুণ্য-কথা আজ আমাদিগকে আত্মস্থ করিয়া দিউক। দিন গিয়াছে—এই ভারত একদিন জ্ঞানে ধর্ম্মে কত উন্নত ছিল, এদেশের রমণীগণ কত শক্তিশালিনী ছিলেন! কবে আমাদের সব সাধনা যথার্থ মাতৃপূজায় পরিণত হইবে!

বড় দুঃসময়ে আমরা মিলিত হইতে আসিয়াছি—কিন্তু দুর্দ্দিনের মিলনই যথার্থ মিলন। আজ আমাদের প্রাণ-মন-বাক্য এই মিলনকে সার্থক করিয়া তুলুক। বুঝি আজিকার মত দুর্দ্দিন ভারতাকাশে কখনও আসে নাই—এত-কালের দীর্ঘ ইতিহাসে এত দীর্ঘশ্বাস বোধ হয় আর কখনও পড়ে নাই, এত বিপন্ন আর আমরা হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আজ এই বিশাল প্রদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহই অবসাদাচ্ছন্ন—প্রিয়জন বিরহে কাতর! আমরা রমণী—সহ্য করাই আমাদের ধর্ম্ম—সর্ব্বংসহা ধরণীর মতই ধীর থাকিতে হইবে। নিষ্ফল ক্রন্দনে কোন লাভ নাই। আজ আমাদেরও কাজ আছে। দেশের যে কাজ পুরুষগণ অসমাপ্ত রাখিয়া কারাগার বরণ করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের নয়নের অশ্রু মুছিয়া বক্ষের বেদনা বক্ষে চাপিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেই হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায় সে দেশের পুরুষগণ প্রায় সকলেই যখন রণক্ষেত্রে গিয়াছিলেন তখন

কিরূপে পাশ্চাত্য রমণীগণ তাঁহাদের অসমাপ্ত কর্ম্মভার মাথায় তুলিয়া দীর্ঘ চারি বৎসর সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাহারাও রমণী আমরাও রমণী—তাহারাও সন্তানের জননী, পতির প্রেমময়ী পত্নী, ভ্রাতার স্নেহের ভগিনী। অথচ বৃথা ক্রন্দনে কালক্ষেপ না করিয়া যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, বীর পুরুষদের রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন সার্থক হয়, জন্মভূমির মর্য্যাদা রক্ষা হয় তাহার জন্ম অন্তরের ব্যথা অন্তরে সংগোপন রাখিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং দেশের সেই দুর্দ্দিনে দেশের সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন।—আমাদেরও আজ সেই আদর্শ অনুকরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ আমাদের সকল প্রদেশের নেতৃগণ তরুণ যুবকগণ দেশের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া লইয়াছেন—তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের অসমাপ্ত কার্য্য যদি আমরা মাথায় তুলিয়া না লই তবে বৃথাই তাঁহাদের এই লাঞ্ছনা। ভগিনীগণ! আমরা সকলেই সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর অংশস্বরূপা। আজ আমাদের শক্তি পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। জগতের ইতিহাসে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহীগণের শক্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। যে শক্তির প্রভাবে হাসিতে হাসিতে তাঁহারা জলন্ত চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং যে শক্তির প্রভাবে মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন, সেই শক্তির উত্তরাধিকারিণী কি আমরা হইতে পারিব না?—নিশ্চয়ই পারিব। কথিত আছে, ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা মৃত স্বামীর প্রাণের সন্ধান এই কামরূপেই পাইয়াছিলেন—এই সেই পুণ্যভূমি। আজ আমাদের দেখিতে হইবে কিরূপে আমাদের সেই শক্তির বিকাশ হয়। আজ আর কথার সময় নাই—কাজে লাগিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন—স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদের একমাত্র অস্ত্র চরকা। সম্প্রতি এই অস্ত্র-চালনেই আমাদের সকল শক্তির নিয়োগ করিতে হইবে। এই চরকা অস্ত্র আজ এই সংগ্রামে আমাদের গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যেদিন ভারতের সুদিন ছিল, যে দিন বিদেশী আমাদের লজ্জানিবারণের বস্ত্র যোগাইত না, সেদিন ভারতের রমণীগণই প্রধানতঃ নিজেদের লজ্জানিবারণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সভা সমিতি করিয়া তাহাদের এই কার্য্যভার চালাইবার উপদেশ দিতে হয় নাই। আহার বিহার যেমন দৈনন্দিন ব্যাপার, সুতা-কাটা, বস্ত্রবয়ন করও সেইরূপই ছিল—তখন আমরা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিয়াও জগতের বিলাসের বসন যোগাইয়াছি। সে সব কথা আজ অতীত

কাহিনী। আজ আমরা নিজেই নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়াছি—বিলাসের মোহে ডুবিয়া আমরা সেই অতীত গৌরব ভুলিয়া গিয়াছি। মহাশক্তির অংশ-স্বরূপিনী হইয়াও আমরা সেই শক্তির খর্ব্ব করিয়াছি। আজ আবার আমাদের সেই লুপ্ত শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে—তাহারই দিন আজ আসিয়াছে। এই বস্ত্র-সমস্যা মিটাইতে না পারিলে আমাদের স্বরাজ লাভ সুদূরপরাহত। বাল্য-কালের স্মৃতি আমার যতখানি আছে তাহাতে আমার মনে হয় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই আসামে জাতি নির্ব্বিশেষে প্রতি গৃহেই চরকা এবং অধিকাংশ গৃহেই তাঁত দেখিয়াছি। তাঁহারা অম্লানবদনে গৃহকার্য্যের অবসরে সূতা কাটিয়া নিজেদের পরিবারের বসনের অভাব দূর করিয়াছেন এবং নিজ হাতের প্রস্তুত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া আপনাদের গৌরবান্বিত মনে করিয়াছে। এখনও আমার আসামী ভগিনীগণ অনেকেই সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়নে সুনিপুণা। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বিদেশী বস্ত্র আসাম হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে পারেন। যাহারা এই কর্ম্মে সুদক্ষা, তাহাদের কেহ কেহ অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া অন্যান্য ভগিনীগণকে যাহাতে এই কার্য্যে দীক্ষিতা করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন।

আমরা যদি এই বস্ত্রসমস্যার সমাধান নিজেরা করিয়া উঠিতে পারি, ভাবিয়া দেখুন যাঁহারা আজ কারাগৃহে বন্দী অবস্থায় আছেন তাঁহারা আনন্দে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিবেন কি না? জাতির অতীত গৌরব যদি আমরা সমবেত চেষ্টায় ফিরাইয়া আনিতে পারি, তবে কারাবাস তাঁহাদের স্বর্গ-বাসের তুল্যই হইবে। আমরা হিন্দু-রমণী স্বামীপুত্রের জন্য হাসিমুখে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। আর আজ তাহাদের ও দেশের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য এই শক্তিতে শক্তিশালিনী কি হইতে পারিব না? আসুন, আমরা এই পুণ্যক্ষেত্রে শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণপণে বিদেশীবর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দীক্ষা গ্রহণ করি—মহাশক্তি আমাদের শক্তি দিবেন।

আর একটী নিবেদন আমার ভগিনীদের নিকট আমার আছে, তাহা এই অস্পৃশ্যতার কথা। আজ ভারতের দুর্দ্দিনের আর একটি কারণ এই ভেদজ্ঞান। এই বৈষ্ণবপ্রধান আসাম প্রদেশে আমায় বুঝাইতে হইবে না—যে আচণ্ডাল সকলকে কোলে টানিয়া লওয়াই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। ত্রেতাতে ভগবান রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত মিতালী পাতাইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপাশে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন; আসামের শঙ্করদেব জাতিতে কায়স্থবংশসম্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণদের

শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, অদ্যাপি এদেশের ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী আছেন। আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নারায়ণজ্ঞানে সর্ব্বজীবে সমভাব দেখাইয়াছিলেন—তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদজ্ঞান ছিল না। চরিত্র-বলই চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করিয় তুলে এবং তাহার অভাবেই ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মার শুচিত্ব বাক্য ও মনে না রাখিলে, শুধু বাহ্যাড়ম্বেই শুচিত্ব রক্ষা হয় না। আমার মন পবিত্র থাকিলে কোন কিছুতেই আমার পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে না, ইহা ধ্রুব। আমরা দুর্দ্দশার এমন চরমসীমায় আসিয়াছি যে মানব যে নারায়ণের অংশ, আমারই মত যাহার রক্তমাংসের শরীর, স্নেহ, প্রেম, মমতা আমারই অনুরূপ, তাহাকে নীচ জাতি বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি। যেখানে গৃহমার্জ্জারের প্রবেশাধিকার আছে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হইয়া তাহার সে অধিকার নাই। সে ঘরে আসিলে গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহাকে স্পর্শ করিলে অবগাহন করিতে হইবে। যতদিন আমাদের এই ভেদ-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন দেশের উন্নতির কোন আশা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ভগিনীগণ, এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি কিছুই নাই? আমরা মায়ের জাতি হইয়া পরমাবৈষ্ণবী ভগবতীর অংশ হইয়া এই নিষ্ঠুর আচার মানিয়া চলিব? তাহা যদি হয় তবে আমাদের মাতৃত্বে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। বহুদিন প্রচলিত এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সংগ্রাম করিতেই হইবে। নারীশক্তি ইচ্ছা করিলে এমন কাজ নাই যাহা করিতে পারেনা—ইহা ত সামান্য দেশাচার। আমরা সকলে একপ্রাণ হইলেই এই নিষ্ঠুর নির্ম্মম দেশা-চার দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আপনারা সকলেই জানেন আচার ব্যবহারে আমাদের পুরুষগণ অত কঠোর নহেন। তাঁহাদের অনেকের মধ্যে অস্পৃশ্যতার দোষজ্ঞান নাই। তাঁহারা অশনে বসনে ইহা বেশী মানিয়া চলেন না—কিন্তু আমরা রমণীগণই এই কুপ্রথাকে সাগ্নিকের অগ্নির মত আমাদের গৃহে জ্বালাইয়া রাখিয়াছি। আমরা যদি একটু উদারতা দেখাই পুরুষের সাধ্য নাই এই কুসংস্কার দেশে পোষণ করিয়া রাখিতে পারেন। এই অগ্নি আমরাই জ্বালিয়াছি—আমাদেরই নিভাইতে হইবে। জননীগণ, একবার ভাবিয়া দেখুন কি নিষ্ঠুরতার খেলা আমরা দৈনন্দিন জীবনে খেলিতেছি। এই কুসংস্কার প্রচলিত থাকিলে দেশের সর্ব্বনাশ। একদল লোককে আমরা হীন করিয়া নিজেরাই হীন হইয়া পড়িতেছি।

নীচজাতি বলিয়া তাহাদের ঘৃণা না করিয়া যদি তাহাদেরও কর্ম্মক্ষেত্রে

টানিয়া আনি, তাহাদের বুঝাইয়া দেই তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও আমাদের সহিত একাসনে বসিবার এবং আমাদের সহিত একযোগে কাজ করিবার দাবী আছে—আমাদের সহানুভূতি যদি তাহারা পায়—কার্য্যকালে তাহাদের কাছে আমরাও বঞ্চিত হইব না। মহাত্মা গান্ধী বারে বারে আমাদের এ বিষয় বলিয়াছেন—আমার এ বিষয় অধিক বাহুল্য। দেশের কল্যাণের নিমিত্ত আজ তিনি ইংরাজের কারাগারে বন্দী। তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার এই আমাদের উপযুক্ত সময়। আশা করি তাঁহার এই আদেশ পালন করিয়া তাঁহার উপর শ্রদ্ধা দেখাইতে আমরা কৃপণতা করিব না।

দেশের অন্যান্য নায়কগণ ইতিপূর্ব্বেই বন্দী হইয়াছেন আজ মহাত্মাও কারাগারে বন্দী—কিন্তু সে জন্য ভগ্নোত্তম হইবার কোন কারণ নাই। বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা জানিয়াই ত আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার ধ্রুব বিশ্বাস—যদি আমরা ভীত নিরুৎসাহ না হই, যদি অন্যায় পথে না চলি যদি দেশমাতার আহ্বান আমাদের অন্তরে যথার্থ ই পৌছিয়া থাকে তবে আমাদের শক্তির অভাব হইবে না যিনি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকাকে চালনা করেন বিজয়ীর ভ্রূকুটি, বিজিতের অশ্রুজল কিছুই যাহার সদাজাগ্রত চক্ষুকে এড়ায় না—এই পৃথিবীতে কত অপমানিত পদদলিত ক্ষুদ্র জাতিকে যিনি এক নিমেষে গৌরবের অত্যুজ্জ্বল শিখরে উঠায়াছেন আবার কত গর্ব্বী, অত্যাচারী সাম্রাজ্যকে ধূলিশয্যায় লুটাইয়া দিয়াছেন, তিনিই সম্পদ, বিপদ, সুখ, দুঃখের বন্ধুর পথ দিয়া মুক্তির দিকে আমাদিগকে চালনা করিবেন।

লতা

(শ্রীউর্ম্মিলা দেবী)

(১)

লতা আজ আর এ সংসারে নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের করুণ ইতিহাসটুকু আজ আমি সকলের নিকট উপস্থিত না করিয়া পারিলাম না। লতা অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জীবনের সহিত এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া গিয়াছিল যে, আজও তাহার কথা স্মরণ হইলে আমার বুকের খানিক অংশ শূন্য বলিয়া মনে হয়।

শিশুকাল হইতেই লতার স্বভাবটি একটু অদ্ভুত রকমের ছিল। যে বয়সে ক্ষুদ্র শিশুগণ হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া, ঝগড়া মারামারি ও দৌরাত্ম্য করিয়া পাড়া মথায় করে, সে বয়সেও লতা খেলাধূলা ছাড়িয়া নদীর পাড়ে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতেই ভালবাসিত।

ক্ষুদ্র নদীটী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারই তীরে লতাপাতা ঘেরা তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহখানি। গৃহে বৃদ্ধা বিধবা ঠাকুরমা ও বিধবা মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। লতার এক কাকা ছিলেন, তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। পর পর তিনটী মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর লতা জন্মিয়াছিল। জীবিত সন্তানকে শুভাগমন উপলক্ষে যখন গৃহ আনন্দোৎসবে মগ্ন তখন সকল আনন্দ নিরানন্দে মগ্ন করিয়া তিন দিনের মধ্যে লতার পিতা দেহ ত্যাগ করিলেন। সেই অবধি সকলেই তাহাকে "অপয়া" অলক্ষণা নামে অভিহিত করিত, কেবল তাহার সদ্য বিধবা দুঃখিনী মাতা তাহাকে দ্বিগুণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেন। আহা! জন্মিয়া যে একদিনের জন্যও পিতৃস্নেহ পাইল না তাহার মত অভাগিনী জগতে কে আছে, মানুষে কোন প্রাণে তাহাকে দোষী করে! পিতার মৃত্যুর জন্য কি সে দায়ী? তাঁহার অভাবে অন্য কাহারও অপেক্ষা কি তাহার ক্ষতি কিছু কম হইয়াছে, এই সব চিন্তার পর দুঃখিনী বিধবা চক্ষের জলে ভাসিয়া লতাকে বুকে চাপিয়া ধরিতেন।

ক্ষুদ্র লতা একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর মুখে অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। কেহ কখনও লতাকে উচ্চ হাস্য করিতে শোনে নাই, তাহার সুন্দর মুখ খানিতে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই তাহা ওষ্ঠ প্রান্তে মিলাইয়া যাইত। সে একা একা খেলিতেই ভাল বাসিত, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া তাহার সহিত খেলা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। মা যখন বলিতেন, যা না লতা ওদের সঙ্গে খেল্‌গে যা, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লতা উঠিত। সে মার কথার অবাধ্য কখনও হইত না। কিন্তু পাড়ার শিশুরা যখন দেখিত লতাকে লইলে তাহাদের খেলা মোটেই জমে না তখন তাহারা লতাকে ছাড়িয়া দিত, লতাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত।

সে প্রায়ই নদীতীরে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিত। ক্ষুদ্র নৌকাগুলি পাল তুলিয়া বাতাসের বেগে উড়িয়া যাইতেছে, দুধের মত সাদা হাঁসগুলি পালে পালে সারি সারি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীগুলি কলরব করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে,—লতা বসিয়া

এই সকল দেখিতে ভালবাসিত। পরপারের ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া অপরিসর রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া দলে দলে স্ত্রীলোকগণ কলসী কক্ষে জল তুলিতে ও স্নান করিতে আসিত। তাহারা জলে নামিয়া ঝাঁপা-ঝাঁপি করিত, হাসি গল্প, কলহ বিবাদ করিত, কেহ কেহ বা এ উহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছে লতা বড় বড় চোখ ছুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া তাহাদের রকম সকল দেখিত। মাঝে মাঝে সে অঁাচল করিয়া ফুল তুলিয়া আনিত, জলে পা ডুবাইয়া ঘাটে বসিয়া ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথিত; গাঁথিতে গাঁথিতে অর্দ্ধ গ্রথিত মালা তাহার শিথিল হস্ত চ্যুত হইয়া কখন যে পড়িয়া যাইত তাহা সে নিজেই জানিত না।

তাহার এই সকল ভাব দেখিয়া, পাড়ার স্ত্রীলোকগণ "বোকা মেয়ে" "হাবা মেয়ে" নামে তাহাকে অভিহিত করিত। সে তাহার ঠাকুরমার কাছে বড় ঘেঁষিত না। পুত্র শোকাতুরা বৃদ্ধা এই অলক্ষণা নাতিনীটিকেই তাহার পুত্রের মৃত্যুর একমাত্র কারণ জানিয়া, প্রথম হইতেই তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না লতা যদি অন্যান্য শিশুদিগের মত হাসির লহর তুলিয়া দুষ্টামী ও নানারূপ ফন্দী করিয়া তাহার ঠাকুরমার চিত্ত জয় করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না—কিন্তু লতারও সে বিষয়ে কোন চেষ্টা দেখা গেল না। তাহার ক্ষুদ্র শিশু প্রাণে এই নিকটতম আত্মীয়ার সম্বন্ধে একটা ভীতির ভাবই লক্ষিত হইত। তাহাকে অত্যধিক আদর যত্ন করার অপরাধে তাহার মাতার প্রতিও তাহার ঠাকুরমা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পঞ্চম স্বর সপ্তমে তুলিয়া তিনি যখন বধূর উদ্দেশে বলিতেন,—"বলি হ্যাঁগা বৌমা! মেয়ের আব্দার এত কেন তোমার কি একটু লজ্জাও নেই বাছা! যে অপয়া মেয়েটা তোমার অমন দেবতার মত সোয়ামীকে খেলে তাকেই আবার এত যত্ন আত্তি, ধন্য যা হোক! কলিকালে কতই দেখব! আমাদের কালে হ'লে অমন অলুক্ষুণে মেয়ের দিকে কেউ ফিরেও চাইত না" তখন ক্ষুদ্র শিশু ঠাকুরমার কথার অর্থগুলি না বুঝিলেও, মাতার অঞ্চলের আড়াল হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার বিরক্তি পূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। শ্বশ্রূর কর্কশ বাক্যে বধূর শোকক্লিষ্ট হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিত। সে কোন কথার উত্তর দিত না, পাছে চক্ষে অশ্রু দেখিলে শ্বশ্রূ আরও বিরক্ত হন এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি লতাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিত। হৃদয়ের বেদনা যেদিন অসহনীয় হইত সেই

দিন সে ঠাকুরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রু মোচন করিত। সজল নয়নে যুক্ত করে বলিত, "ঠাকুর! পিতৃহীনের পিতা তুমি, আমার এই পিতৃহীনা শিশুর মঙ্গল কর।"

ক্ষুদ্র লতা আর কিছু না হইলেও ইহা বুঝিত ঠাকুরমা তাহার স্নেহময়ী মাতাকে তিরস্কার করিতেছেন। তাই ঠাকুরমার প্রতি তাহার মন আরও বিরূপ হইয়া উঠিত।

লতার গাম্ভীর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিত তাহার মাতার নিকট। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর রাত্রে যখন তাহাদের ক্ষুদ্র শয্যার উপর তাহার মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেন তখন লতার মনের বাঁধন খুলিয়া যাইত। মাতার বুকে মুখ লুকাইয়া সে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথাগুলি মায়ের কাছে বলিত। তারপর নানারূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিত।

(২)

এইরূপে লতা কৈশোরে পদার্পণ করিল। তাহার স্ফুটনোন্মুখ দেহে লাবণ্য উথলিয়া পড়িত নির্নিমেষ নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মাতা মনে মনে বলিতেন—"আজ তুমি কোথায় প্রভু! যে পাঁচ দিনের শিশুকে আমার কোলে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলে আজ তাহাকে দেখিলে যে তোমার হৃদয় গর্ব্বে ও আনন্দে পূর্ণ হইত।"

দ্বাদশবর্ষীয়া লতা নিঃশব্দে গৃহকার্য্য করে, ঠাকুরমার পূজার ফুল তোলে, গৃহ কর্ম্মে মাতার সহায়তা করে, গোপীনাথের পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। এখনও তাহার বদনে তেমনই গাম্ভার্য্য,—নয়নে তেমনই উদাস দৃষ্টি! তাহার ঠাকুরমাও এখন তাহার উপর সদয়।

লতার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ প্রায়, কিন্তু বিবাহের চেষ্টা ও উদ্যোগ করে কে? তাহার খুল্লতাত বিদেশে থাকেন, দুই তিন বৎসর অন্তর বাড়ী আসেন। কনিষ্ঠ পুত্রবধূর সহিত বৃদ্ধা শ্বশ্রূর কখনও বনাবনি হইত না, সুতরাং পুত্রের কর্ম্মস্থানে তিনি কখনও যাইতেন না। পুত্রও মাসে মাসে খরচের অর্থ প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, মাতা ও বিধবা ভ্রাতৃবধূ এবং পিতৃহীনা লতাকে নিজের নিকট লইয়া যাইবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি তাঁহার মুখরা স্ত্রীটিকে একটু ভয় করিয়াই চলিতেন। আর বিশেষতঃ গৃহে বিগ্রহের সেবা তো বন্ধ করিলে চলে না। লতার মাতা ও পিতামহী তাঁহার কাছে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পাইয়া, হতাশ হইয়া যখন

প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন তখন বিধি সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।

প্রসাদপুরের জমীদার হরকান্ত চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র নির্ম্মলকান্ত এক বন্ধুর সহিত শিকারে আসিয়া একদিন দৈবক্রমে লতাকে দেখিয়া গেল। সদ্যস্নাতা মুক্তকেশী লতা তখন নদীতীরে পা ছড়াইয়া দিয়া গোপীনাথের পূজার জন্য মালা গাঁথিতেছিল।

তিন দিন পর জমীদার গৃহ হইতে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যখন লোকজন আসিল, তখন লতার মাতা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া হাতা বেড়ী ফেলিয়া দিয়া তিনি গোপীনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। দুঃখিনীর একমাত্র স্নেহের অবলম্বন কি আজ সত্যই রাজরাণী হইতে চলিল, পরলোক হইতে তাঁহার দেবতা কি আজ সকলই জানিতে পারিতেছেন? তাহা না হইলে বুঝি তাঁহার সুখ সম্পূর্ণ হইবে না।

জমীদার গৃহে বিবাহের সংবাদ শুনিয়া লতার কাকা ছুটি লইয়া আসিলেন। লতার কাকীমা কত যত্ন করিয়া লতাকে সাজাইতে বসিয়া গেলেন। লতাদের পক্ষ হইতে না হইলেও, জমীদারের পক্ষ হইয়া মহাসমারোহে বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেল। জমীদার মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কন্যাপক্ষের ব্যয়-ভার স্বয়ং বহন করিলেন।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে জামাতার হস্তে কন্যার হস্ত তুলিয়া দিয়া লতার মাতা ছল ছল চক্ষে যখন বলিলেন,—"দুঃখিনীর দুঃখের ধন তোমায় দিলাম বাবা! তাকে যত্ন কোর—আর কি বল্‌ব"—

অশ্রুজলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল নির্ম্মলকান্ত তখন কোন কথা না কহিয়া, দুই হস্তে শ্বশ্রূর পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। তাহার চক্ষুও তখন সিক্ত। আর লতা? লতা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মাতার অশ্রুবিবর্ণ মুখের দিকে কাতর নেত্রে চাহিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তারপরে লতা বহু সমাদরে, ঢাক ঢোল সানাই মুখরিত, আলোকমালায় সজ্জিত প্রকাণ্ড পুরীতে, পুরনারীর শঙ্খরোলমধ্যে শ্বশুরালয়ে গৃহীত হইল।

প্রাঙ্গণে পালকী নামিতেই, সহাস্যবদনা শ্বশ্রূমাতা অগ্রসর হইয়া, "এস — এস আমার মা লক্ষ্মী এস—আমার ঘর আলো করসে"—বলিয়া সাদরে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। স্ত্রী আচার হইয়া গেলে, জমীদার বাবু আসিয়া হীরক মণ্ডিত কণ্ঠহার দিয়া বধূমাতার মুখ দর্শন করিলেন। আনন্দ-

গদ্ গদ্ কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন,—"আজ দশ বৎসর মা হারা হয়েছি—আজ আবার মা ফিরে পেলাম। কেমন মা—এই বুড় ছেলের মা হ'তে পারবে তো" লজ্জারক্ত নব বধূ লতা অবনত মস্তক আরও অবনত করিল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী স্ত্রীর প্রথম আলাপ হইল। ফুলশয্যার স্ত্রী আচারাদি সমাপনান্তে আত্মীয়গণ গৃহত্যাগ করিলে পর শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্টা, অবগুণ্ঠিতা লতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিয়া, নির্ম্মল তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে তাহার দিকে চাহিল। লতাও চকিতে একবার স্বামীর প্রতি চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি অবনত করিল। হাসিয়া নির্ম্মল বলিল,—"কেমন লতা! আমাদের বাড়ীতে এসে তোমার কোন কষ্ট নেই তো?" লতা বড় বোকা মেয়ে, স্বামীকে যে লজ্জা করিতে হয় তাহা সে একেবারেই জানিত না। বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, লতা বলিল,—কষ্ট কই কষ্ট কিছু নেই তো! তবে মার জন্য বড় মন কেমন করে—বলিতে বলিতে লতার বড় বড় চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। সাদরে তাহার অশ্রু মোচন করিয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নির্ম্মল বলিল,—

"শীগ্যিরই তো মায়ের কাছে যাবে লতা! কেঁদনা ছিঃ—লক্ষ্মীটি! তুমি কাঁদলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

অষ্টমঙ্গল হইয়া গেলে, লতা পুনরায় পিত্রালয়ে গেল, নির্ম্মলও এবার সঙ্গে গেল। সেদিন লতার বড় আনন্দ! মাতার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছে—আবার সঙ্গে স্বামী! লতা এই কয়দিনেই স্বামী চিনিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে বড় শীঘ্র স্বামীর মর্ম্ম বুঝিতে শেখে। পক্ষকাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া, নির্ম্মল বাড়ী ফিরিল। যাত্রার পূর্ব্বে লতার নিকট বিদায় লইতে গিয়া, তাহাকে বাহুবেষ্টনে লইয়া, সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া যখন নির্ম্মল বলিল,—"তবে যাই লতা! আর শীঘ্র দেখা বোধ হয় হবে না। আমি শীগ্যিরই কলকাতায় চলে যাব। বাবার ইচ্ছা এম, এ টা পাশ করা পর্য্যন্ত আর বাড়ী না আসি। আমিও মনে করি তাই ভাল। এই মুখ খানার প্রলোভন বেশী। সে প্রলোভন আপাততঃ ত্যাগ করতে না পারলে পরীক্ষায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমায় ভুলো না লতা, চিঠি লিখো—আর আমার বাবা ও মায়ের যত্ন কোর।" তখন স্বল্পভাষিণী লতা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল। নির্ম্মল তাহার অশ্রু মোচন করিয়া দিয়া তাহার ফুল্ল কুসুমতুল্য ওষ্ঠাধরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিল। তার পর দুই বৎসর লতা কখনও পিত্রালয়ে

কখনও শ্বশুরালয়ে থাকিয়া একটি একটি করিয়া দিন গণিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় আশাপূর্ণ হৃদয়ে কাটাইয়া দিল।

প্রথম বৎসর নির্ম্মল নিয়মিত পত্র লিখিত, দ্বিতীয় বৎসর পত্র ব্যবহার কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। লতা বুঝিল পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই সংযম। সেও অনাবশ্যক প্রশ্ন পূর্ণ পত্র লিখিয়া স্বামীকে বিরক্ত করিল না।

(৩)

দুই বৎসর পর এম এ পাশ করিয়া নির্ম্মলকান্ত হুগলী কলেজের প্রফেসরী পাইয়া গৃহে ফিরিল। জমীদারের পুত্র হইলেও সে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে একেবারেই নারাজ। যেদিন দীর্ঘ দুই বৎসর পর নির্ম্মলকান্ত গৃহে প্রত্যাগমন করিল সেদিন লতা যে কি ভাবে সময় কাটাইল তাহা সে নিজেই জানিল না।

জমীদার গৃহে বধূর গৃহ কর্ম্ম করিতে হয় না। তাস খেলিয়া গল্প করিয়াই তাহাদের সময় কাটাইবার কথা। কিন্তু গ্রাম্য বালিকা আজকালকার মেয়েদের মত সেয়ানা নয়। সে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। স্বামীর অনুরোধ "বাবা মার যত্ন কোর" সে মাথায় পাতিয়া লইয়াছিল। তাহার নিপুণ হস্তের সেবা পাইয়া বৃদ্ধ জমীদার একেবারে শিশুর মতই বধূর হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া, "মা মণি।" বলিয়া ডাকিতেন, তখন সহস্র কার্য্যে আবদ্ধ থাকিলেও লতা সব ফেলিয়া আসিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইত। তিনিও আদর করিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া, "আজ তোমার এই লোভী ছেলেটির জন্য কি রেঁধেছ—মা?" কিম্বা "অমুক ব্যঞ্জনটা রেঁধ মা মণি! ওটা তোমার হাতে যেমন হয় তেমন আর কারও হাতে হয় না—"আজ আমার পূজোর সাজ তুমি করনি—না মা? আমি আগেই জানি। আমার মায়ের হাতে কি অমন বিশ্রী সাজ হ'তে পারে? আজ আমার ভাল করে পূজাই হয় নি। কাল থেকে সব কাজ ফেলে তুমি আমার পূজোর সাজ করবে—কেমন মা মণি?"লতা অমনি আনন্দোৎফুল্ল বদনে মৃদুস্বরে বলিত—হাঁ।

লতা দরিদ্রের গৃহে প্রতিপালিতা,—অল্প বয়সেই রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিতে শিখিয়াছিল। সে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্বশুর সকলকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইত। জমীদারের প্রকাণ্ড পুরী, নিকট ও দূর সম্পর্কীয় বহুবিধ আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ থাকিত। লতা সাধ্যমত তাঁহাদের সকলেরই পরিচর্য্যা

করিত। তাঁহারাও তাহার সেবায় প্রীত হইয়া তাহাকে "লক্ষ্মী—বৌ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

নির্ম্মলকান্ত দীর্ঘ দুই বৎসর পর বাড়ী আসিতেছে, জমীদার গৃহে আজ আনন্দোৎসব ভোর হইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাল লইয়া জেলেরা আসিয়া পুকুরে জাল ফেলিল। জমীদার মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বড় বড় কয়েকটি মাছ রাখিয়া অন্যান্য সব মাছ পুনরায় ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। জমীদার গৃহিনী স্বয়ং অদ্য রন্ধনশালায় উপস্থিত আসিয়া রন্ধনাদির তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং "মা-লক্ষ্মি! এটা কর" "ওটা কর" বলিয়া লতাকে উপদেশ দিতেছেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিয়া পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের তরঙ্গ ওঠে, তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? তিনি সকল কর্ম্মে ব্যবহৃত থাকিলেও, শকটের শব্দ শুনিবার জন্য তাঁহার কর্ণদ্বয় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। মদন গোয়ালা জমীদার বাড়ীর বংশানুক্রমিক গোয়ালা। ফরমাইসি দই লইয়া উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিল,—

"মা ঠাকরুণ দই এনেছি গো। এই দই খানা দাদাবাবুর জন্য ভিন্ন করে পেতেছি—তিনি মোর দই খেতে বড় ভালবাসে। আহা দুবচ্ছর দাদাবাবুর মুখ দেখিনি তিনি কখন এস্‌বে গো?"

সহাস্য বদনে গৃহিনী বলিলেন,—

"এই এল ব'লে। বেলা দশটার টেরেনে আসবার কথা—বাড়ী পৌঁছুতে বোধ হয় এগারটা হবে। তা দশটা বোধ হয় বাজে।" দূরসম্পর্কীয়া এক ভাগিনেয়বধূ বঁটি পাতিয়া আলু কুটিতেছিলেন। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহিনী বলিলেন, "রাঙ্গাবৌ! দই ক খানা ভাঁড়ারে তুলে রাখ বাছা! কামিনী মদনকে খান কয়েক পুকুরের মাছ দিয়ে দাও তো মা!"

লতা ভাঁড়ার ঘরের এক কোনে বসিয়া খাশুড়ীর নির্দ্দেশ মত, ঠাকুরের বাল ভোগের, ক্ষীর ছানা মাখন ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যাদি গুছাইতে ছিল। সে ধীরে ধীরে খাশুড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল,—

"দু খানা দই নিরামিষ ঘরে দিয়ে এলে হয় না মা?"

খাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন,—

"ঠিক বলেছ মালক্ষ্মি! আমার কি সব কথা ছাই এখন মনে থাকে? যাও তো মা, রাঙ্গা বৌকে বলে এস। আর সন্দেশ বুঝি এখনও আসেনি এরা যে কি করে, সময় মত কিছুই আর এদের দিয়ে হয় না।"

মৃদুস্বরে লতা বলিল,—"আমি দেখ্‌ছি মা"! লতা সংবাদ লইয়া জানিল সন্দেশ বহুক্ষণ আসিয়াছে। সে দুই হাঁড়ি দই ও কিছু সন্দেশ নিজ হস্তে নিরামিষ ঘরে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া খাশুড়ীকে জানাইল সন্দেশ আসিয়াছে। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

লতা ও নিশ্চিন্তা হইয়া তখন তাহার নিয়মিত রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আজ স্বামী প্রথম তাহার হাতের রান্না খাইবেন,—লতা কত রকম করিয়া কত ব্যঞ্জন রাঁধিল তবু তাহার তৃপ্তি নাই। কেবলই মনে হইতেছে "এটা ভাল হয় নাই" "ওটা ভাল হয় নাই।" যত্ন করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে বড় সুখ। এ সুখের স্বাদ যে কখনও পায় নাই তাহার বড় দুঃখ। লতা রাঁধিতে রাঁধিতে এই কথাই ভাবিতে ছিল।

এমন সময় বহির্ব্বাটিতে কোলাহল উঠিল, 'ছোট বাবু এসেছে" "ছোট বাবু এসেছে।" লতার বুকের রক্ত, দ্রুত চলিতে লাগিল, সে স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্ম দেবতার উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর তার সময়টা যে কেমন করিয়া কাটিল তা, সে জানিল না। নির্ম্মলকান্ত আহারে বসিলে তাহার খাশুড়ী যখন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মি! তোমার রান্না তরকারী দিয়ে যাও" তখন সহস্র চেষ্টায়ও সে উঠিতে পারিল না। তাহার পা দু খানা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। বামন ঠাকরুণ আসিয়া ব্যঞ্জণ পরিবেশন করিল। রাঙ্গাবৌ আসিয়া হাসিয়া বলিল, "তোর কি হয়েছে নতুনবৌ; উঠতে কি পারিস না; যা না ঐ ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে একটু দেখে আয় সে ঘরে এখন কেউ নেই যা জন্ম সার্থক করে আয়।" সে কোন উত্তর দিল না,—তাহার বাক্‌শক্তিও যেন কে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। রাঙ্গাবৌ তাহার হাত ধরিয়া অনেক টানাটানি করিল,—অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আহারে বসিয়া নির্ম্মলের চঞ্চল চক্ষু দুটি যেন কিসের আশায় ব্যস্ত হইয়া এদিক ও দিক করিতেছিল। কিন্তু চক্ষুর আশা পূর্ণ হইল না, নিরাশ হইয়া তাহারা আবার ভাতের থালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ঠিক সেই সময়েই মাতা ডাকিলেন,—"মালক্ষ্মি তোমার রান্না তরকারী দিয়ে যাও।" কিন্তু হায়! "মালক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে বামুন ঠাকরুণ গেল।

আহারান্তে আচমন করিয়া নির্ম্মলকান্ত বলিল,—"আমি তবে এখন একটু

বৈঠকখানায় যাই মা! অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য বসে রয়েছে। বাবার কি খাওয়া হয়নি?"

"না– তার এখনও পুজো হয়নি। তুমি বেশীক্ষণ বাইরে থেকোনা বাবা কাল রাত্রে ঘুম হয়নি আজ দুপুরে একটু ঘুমুতে হবে।" ঈষৎ হাসিয়া নির্ম্মল বলিল,—"আচ্ছা মা।"

বাহিরে যাইবার সময়ও তাহার সোৎসুক দৃষ্টি সকল গুলি দরজার আড়ালে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া গেল, কিন্তু যাহার সন্ধানে সে দৃষ্টি ফিরিতেছিল সে তখনও রান্না ঘরে অসাড় হইয়া বসিয়া আছে।

বামাদাসী যখন আসিয়া তাহাকে বলিল, "বলি হ্যাঁগা বৌদি, অমন করে পাথরের মত আর কতক্ষণ বসে থাকবে? মা যে তোমায় ডাকৃতে লেগেছে— কর্ত্তাবাবুর খাওয়ার ঠাঁই হয়েছে"—তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে লজ্জিত হইয়া শশব্যস্তে উঠিল,—শ্বশুরের আহারের দ্রব্যাদি লইয়া যখন সে আহারের স্থানে উপস্থিত হইল তখনও তাহার পা দুখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। শ্বশুর আহারে বসিলে সে অভ্যাস মত পাখা হস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে বসিল। কিন্তু আজ সে বড়ই অন্যমনস্ক, ব্যজনী থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল।

আহারান্তে নিত্যকার মত শাশুড়ীর পদসেবা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি বলিলেন, —"আজ আর দরকার নেই মা, আজ তুমি বরং তোমার মা'র কাছে চিঠি লেখ গিয়ে—অনেক দিন তো চিঠি লেখনি।" লজ্জায় লতার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল,—সে শাশুড়ীর কথার অর্থ বুঝিয়াছিল।

কাম্পত পদদ্বয় টানিতে টানিতে লতা তাহার শয়ন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। ঈষৎ মুক্ত দ্বারাভ্যন্তর দিয়া সে দেখিল স্বামী শয্যায় শয়ান। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিল। শয্যাপ্রান্তে নির্ম্মল নিমীলিত নেত্রে শয়ান, দেখিয়া বোধ হইল নিদ্রিত। লতা অতি সন্তর্পণে গিয়া শয্যার অপর প্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে এখন কি করিবে ঠিক বুঝিতে পারিল না,— একটু অভিমানও যে না হইল তাহা নয়। সে অঞ্চল প্রান্ত খুটিতে খুটিতে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। সহসা শয্যা ঈষৎ নড়িয়া উঠিল,— পরক্ষণেই দুখানি বিশাল বাহুর কঠিন বেষ্টনে সে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আবেশ বিহ্বল লতাকে বুকে টানিয়া লইয়া, স্বামী চুম্বনের পর চুম্বনে সেই সুন্দর মুখ খানা প্লাবিত করিয়া দিলেন। আনন্দে অর্দ্ধ মুচ্ছিত প্রায় লতা নিমীলিত নেত্রে সেই আনন্দ উপভোগ করিল। ক্রমশঃ

অন্বেষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

১৫

কোন গোপী হ'ল পুতনার মত
কেহ বা তাহার স্তন পান রত
যশোদা দুলাল প্রায়,
কেহ বা শকট অসুর সাজিল
কাঁদি শিশু সম কেহ বা হানিল
চরণ আঘাত তায়।

১৬

কেন হ'ল বালনন্দ কুমার
কেহ গোপী তৃণাবর্ত্ত আকার
তাহারে হরণ করে,
কেহ রাম কেহ কৃষ্ণ সাজিয়া
কিঙ্কিণী রবে হামাগুড়ি দিয়া
চলে বন পথ পরে!

গোচারণ-রত রাখালের মত
হৈ-হৈ রবে চলে গোপী কত
গোষ্ঠের অভিনয়,
কেহ বক কেহ বৎস অসুর
কেহ বাল-লীলা আচরি বঁধুর
বুঝি বা জীবন লয়।

১৭

গোঠ ছাড়ি ধেনু দূরে চলে যায়
ফিরাতে তাহারে বাঁশরী বাজায়
কৃষ্ণ-ভাবিনী কেহ,
ঘিরি তারে যত ব্রজবালা আর
"সাধু-সাধু-সাধু" বলে বার বার
বেপু-পলকিত-দেহ।

কোন বিনোদিনী বঁধু-ভাবে ভোর
চলে বন পথে চথে প্রেম-ঘোর
কারো কাঁধে রাখি হাত,
চলিতে চলিতে তন্ময়-হিয়া
বলে—"আমি কালা দেখনা চাহিয়া
তেমন চরণ-পাত।"

১৮

"বরষণ ঝড়ে না করিয়ো ডর
রক্ষার ভার আমার উপর"
বলি কেহ মধুস্বরে
অম্বর নিজ তুলি শিরপর
ধরিল যতনে—যেন গিরিধর
ধরে গিরি এক করে।

কেহ চড়ি কার মাথার উপরে
আক্রমণ করি লঘুপদভরে
কহিছে ক্রুদ্ধবাণী
"রে পামর অহি! কর পলায়ন
জান না কি মোর গোকুলে জনম
শাসিতে কপট প্রাণী?"

১৯

কালীয়-দমন চলে অভিনয়,—
হেনকালে কেহ বাহু তুলি কয়
আসি সকলের আগে
"ওই চারিদিকে জ্বলে দাবানল,
রহ আঁখি মুদি, এখনি শীতল
করিব নিমেষ ভাগে।"

২০

কোন গোপী যেন মাতা যশোমতী
কহিতে লাগিল হ'য়ে রোষবতী
"আরে আরে ননী চোর!
ভাণ্ড ভাঙিয়া চুরী করি ননী
কোথা যাস্? তোরে বাঁধিব এখনি"
বলিয়া মালিকা ডোর
খুলিয়া বাঁধিল কোনো তরুণীরে
গোপী উদুখলে; আঁচলে অচিরে
ঢাকিয়া বদন সুচারু নয়ন
অমনি তরুণী শিশুর মতন
ভয়-ভান করে ঘোর।

২১

গায়িতে গায়িতে কৃষ্ণনাম
পুছিতে পুছিতে কৃষ্ণধাম
চলে গোপী বন পথ দিয়া
চরণ-কমল খিন্ন;
চলিতে চলিতে বন পথে
সহসা পড়িল আঁখি-পথে
বিস্ময়ে হৃদি চমকিয়া
বঁধুর চরণ-চিহ্ন!

একে কহে আরে—"শোনো, শোনা,
যিনি জগতের প্রাণ মন
নন্দ-ভবন আলোকিত
তারিতে ভুবন দীর্ণ,
পদ্মাঙ্ক তাঁর ওই সখি!
ধ্বজ অঙ্কুশ দেখ লখি,
এ'ত আর কোথা নাহি ছিল
তাঁহার চরণ ভিন্ন।

২২

পরাণ বঁধুর পদাঙ্ক ধরি
কৃষ্ণ-পদবী ঢুঁড়ি চলে,
কার পদরেখা পড়ে মরি! মরি!
সমুখে সহসা আঁখিতলে?
বঁধুর মধুর পদ-বিজড়িত
এ কোন্ বধূর পদ-চীন?
কারে ল'য়ে বঁধু লুকা'ল চকিত?
ভাবে সবে মুখ বিমলিন।

২৩

কহে কোনে ব্রজবালা
"নাথের গভীর পদ রেখা মাঝে
এ কাহার লঘু পদাঙ্ক রাজে
কানন করিয়া আলা?
মনে হয় হেরি যুগ পদ আজ
করিণীরে ল'য়ে যেন গজরাজ
গেল সে নির্জ্জন বনে,
বুঝি সে কান্তা পতনের ডরে
কান্তের কাঁধে রাখি বাম করে
চলে পথ বঁধু সনে।

২৪

"ধন্য তাহার ভাগি!
ধন্য তাহার মধুরারাধনা
বঁধুরে করিল যাহার সাধনা
একান্ত অনুরাগী।
যিনি ঈশ্বর যিনি ভগবান্
যিনি গোবিন্দ জগত পরাণ
মো' সবে ফেলিয়া দূরে

সেই সুভাগিনী নারীরে লইয়া
একাকী পশিলা রমণ মাগিয়া
নিরজন বন-পুরে।

২৫

ধন্য এ ধূলি-কণা!
এরা গোবিন্দ-চরণ-পরশ
ধরিল পুলকে পাতিয়া শিরস
পরম পুণ্যমনা।
আপনি কমলা ব্রহ্মা মহেশ
গোষ্ঠে ধরিয়া রাখালের বেশ
যে পদ-সরোজ চুম্বিত রজ
প্রেমভরে মাথে গায়,
ভাগ্যের ফলে মিলিল তা' যদি
এস, এস সখি! মাখি নিরবধি
লুণ্ঠন করি তায়।"

২৬

অপরা গোপী কহে—"বোলোনা হেন আর,
শুনিয়া তোর কথা জাগে যে মনে ব্যথা,
এই কি সমুচিত বলনা হো'ল তার?
ব্রজের গোপীগণ স'পিল প্রাণ মন
যাহারে, সেই ধন একা সে চুরি করি
গোপনে প্রাণ ভরে' সে সুধা পান করে,
কেমন নারী সে যে বল না সহচরি?

২৭

"হের লো হের সখি!
চরণ-রেখা তার
থামিল হেথা আসি,
চোখে না পড়ে আর

বুঝি বা দূর পথ
গমনে হীন-বল
বিঁধিল তৃণ-শিখা
চরণ সুকোমল।
তাহারে পথ মাঝে
কাতরা হেরি সখি!
বাঁধিয়া বাহু পাশে
বহন করিল কি?
"তাই কি গুরু ভারে
গভীর পদ-রেখা
শুধু লো বঁধুয়ার
ভূতলে যায় দেখা।
দেখ লো দেখ চেয়ে
আবার কিছু দূরে
দোঁহার লঘু পদ
চিহ্ন এল ঘুরে।
বধুরে দিতে বুঝি
কুসুম উপহার
কুসুম-তরু তলে
নামা'ল সুখ-ভার?

২৮

"অগ্র পদ পরে
দাঁড়ায়ে বুঝি ছিল,
নিম্ন শাখা ধরি
কুসুম পেড়েছিল।
হের লো হের সখি!
তাহার পরিচয়
বঁধুর পদ-পাত
পূর্ণ হেথা নয়।

২৯

"তরুর তলা হেরি
হয় লো অনুমান
বসিয়া নটবর
বসা'রে জানু'পর
কামিনী-মুখ-মধু
করিয়া ছিল পান।

প্রিয়ার কেশ পাশে
চয়িত ফুলরাশে
বাঁধিয়া দিল চূড়া
সোহাগে শির প'রে,
"দোঁহার সুখে সুখী
দুজনে মুখোমুখী
চাহিয়া ছিল—হেথা
বসিয়া ক্ষণ তরে।

হের লো হের ধনি!
নূপুর রণ রণি
চপল পদে উঠি
যুগলে গেছে চলি।
নিভৃত নিরজন
শীতল ছায়া ঘন
কুঞ্জে বুঝি কোনো—
চিহ্ন দিল বলি।"

৩০

দেখিতে দেখিতে দেখাতে দেখাতে
এরূপে নাথের চরণ-চীন্
অনুসরি চলে সুন্দরী দলে
কাননে বাহ্য চেতনা হীন।

হেথা বহুদূরে ফেলিয়া সবারে
যারে লয়ে বঁধু গেল একাকী,
দিল বিচিত্র রমণের স্বাদ
রাখি বুকে কভু আড়ালে থাকি।

আপনার মাঝে রমণ যাহার
তিরপিতি যাঁর আপনা মানে,
আপনাতে পরি পূর্ণতা যাঁর,
কাম্য তাঁহার কোথা বিরাজে ?

কামাতীত তবু কামুক সাজিয়া
কামীর দীনতা সহিলা সুখে,
অসীম দৈন্যে অসম সাহস
উপজিল তাহে কামিনী বুকে।

৩১

গোকুল চাঁদের সকল অমিয়া
একাকিনী ধনী পাইয়া হাতে
ভাবিতে লাগিল—সবারে ছাড়িয়া
বধু বাটে সুধা তাহার সাথে।

ভাবিতে লাগিল—চাপি কাম রথে
আইল কত না গোকুল নারী ;
বঁধু শুধু তার হইলা সারথী
বৃন্দা বিপিনে সবারে ছাড়ি।

ভাবিতে ভাবিতে গরব বাড়িল,
ভাবিল—তাহার তুলনা নাই ;
কহে গরবিনী—"চলিতে না পারি,
নিয়ে চল মোরে, তবেত যাই।"

৩২

ধনীর সে ধ্বনি শুনি
হাসি কহে প্রাণনাথ :—
"এস,—এস প্রিয়তমে !
এই ত পাতিনু কাঁধ।"

যেমনি চরণ তুলি
তরুণী চড়িতে যায়,
অমনি লুকা'ল কালা—
কাঁদে ধনী উভরায় :—

৩৩

"না-থ ! না-থ !" [অ]
রমণ ! রমণ ! [অ]
প্রিয়তম ! প্রিয়তম !
দে—হ দে—হ
দরশ দরশ
মহাভুজ পরশন।
"কোথা আছ তুমি ?
এস এস এস
তোমার দাসীর পাশ,
বাঁচিব কেমনে
জড়া'য়ে কণ্ঠে
তোমার বিরহ-পাশ ?"

৩৪

তখন গোপিগণ [অ]
করিছে আগমন
নন্দ-নন্দন—
চরণ অঙ্কন ধরিয়া ;
হেরিলা হ'তে দূর [অ]
বিষাদ—পরিপূর
হৃদয় শত চূর
কে ধনী পথ শেষে পড়িয়া !
নিকটে আসি তার [অ]
চিনিল মুখ তার
শুনিল মুখে তার
বঁধুর সুমধুর ছলনা ;

কেমনে হত-মান
মাধব দিলা মান
কেমনে অভিমান
করিল বঁধু-হারা ললনা !

৩৫

তাহার দশা স্মরি
নয়নে পড়ে ঝরি
আকুলা গোপিকার আঁখি-জল ;
তুলিয়া, ধরি করে,
কানন পথ পরে
আবার চলিল রে গোপিদল।

চাঁদিনী যত দূর
উজলে বন-পুর
বঁধুরে মিলি সবে ঢুঁড়িল রে !
গহন বন-লীন
বঁধুর পদ-চীন্
যখন তমো বুকে মিশিল রে,
আসিল ফিরি তারা ;
অবলা গোপিকারা
ভবন তবু নাহি ভাবিল রে !

৩৬

বঁধুতে বাঁধা মন
বঁধুর আলাপন
বঁধুর পথ'পর
নয়ন তৎপর
বঁধুতে স'পি প্রাণ
বঁধুর করি গান
ভবন-স্মৃতি কার
জাগিল নাহি আর।

৩৭

কৃষ্ণময়ী মরি !
  কৃষ্ণ-বিভাবিনী
কৃষ্ণ-আগমন—
  কেবল কাহিনী
যমুনা তটে পুন
  মিলিয়া গোপিগণ
করিতে লাগিল রে
  কৃষ্ণ কীর্ত্তন।

নারী

(আর্থার শোপেনহাউয়ের্ হইতে

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

শিলারের 'নারী-বন্দনা' (Wirde der Franen) কবিতাটী ভাষাগৌরবে ও ভাববৈচিত্র্যে অতি সুন্দর ; কিন্তু আমার মতে জুয়ি'র (Jouy) একটী ছোট কথা নারীর যথার্থ গৌরবটী প্রকাশ করেছে—'নারী ছাড়া আমাদের জীবনের বিকাশ অসম্ভব, জীবনের মধ্যভাগে কোনই আনন্দ থাকবে না, শেষভাগে কোনই সান্ত্বনা থাকবে না।' কবি বায়রন্ 'সারডানাপেলসে'ও এই কথাটী অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন—

নারীর হৃদয় হতে জীবনের প্রথম বিকাশ
তাহারি অধর হতে আধো ভাষা পেয়েছি বিলাস।
অশ্রু মুছি, শ্বাস সহি, সর্ব্বদা পাশেতে রহি
জীবনের সন্ধ্যাকালে পাপেতাপে দিবে সে আশ্বাস।'

(প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

এই দুইটী উক্তিই নারীকে ঠিকমত বোঝবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

নারীর দেহের গঠনটা একবার ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় যে সে দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম সইবার জন্য সৃষ্ট হয়নি। কাজের দ্বারা তার

জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না,—দুঃখ সহা, সন্তানপ্রসব করা, সন্তান পালন করা ও স্বামীর অনুগামিনী হওয়া থেকেই তার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। স্বামীর সে নিত্য-সহনশীলা আনন্দদায়িনী সখী। জীবনের তীক্ষ্ণতম সুখ বা দুঃখ তার সহ্য হয়নি। কোন বিষয়েই তাকে বেশী শক্তিপ্রয়োগ করতে হয় না। তার জীবনের ধারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী সরল, সহজ ও শান্তিময়—বেশী সুখী বা বেশী দুঃখী হবার তার প্রয়োজনই নেই।

নারীরা স্বভাবতঃই শিশুর মত খামখেয়ালী ও অদূরদর্শী বলে' তারা যে আমাদের বাল্যকালে ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করতে অধিকতর উপযুক্ত তা-ও বেশ বোঝা যায়। সারাজীবন ধরে তারা ঠিক বয়স্ক শিশুর মতই থাকে—শিশু ও পরিণত বয়স্ক লোকের মাঝামাঝি অবস্থা। দেখো—কতদিন ধরে' একজন তরুণী একটা শিশুকে নিয়ে আদর করে, তার সঙ্গে নাচে, গান করে খেলা করে—তারপর সেই স্থানে একটী পুরুষকে বসিয়ে ভেবে দেখো যে তার দৌড় কদিন পর্য্যন্ত যায়।

তরুণ বয়সের নারীদের প্রকৃতি যে দানটী দিয়েছেন, নাট্যকারের ভাষায় সেটাকে 'উজ্জ্বল দৃশ্য' বলা যেতে পারে; কয়েক বছর মাত্র তাদের মনোমোহন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য-সম্পৎ দান করে, বাকী জীবনটা প্রকৃতি তাদের একরকম খর্ব্ব করেই রাখে। এই ক'বছরের মধ্যে তারা পুরুষের মন এমন ক'রে হরণ করতে পারে যে তারা নারীদের সঙ্গে আজীবন একটা বন্ধনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়ে, অথচ এ বন্ধনের মূলে কোনও বিশেষ সঙ্গত কারণ নেই। সে জন্য অন্যান্য প্রাণীর মত অসহায়া নারীকেও জীবনসংগ্রামে যোঝ্‌বার জন্য প্রকৃতিরাণী কতকগুলি অস্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু অন্য স্থানের মত এখানেও প্রকৃতিরাণী নিজ স্বভাবসিদ্ধ মিতব্যয়িতা দেখিয়েছেন। প্রজনন-ক্রিয়া হয়ে গেলেই স্ত্রী-মক্ষিকা যেমন তার পক্ষদুটী হারায়, কারণ আর তাদের কোনো প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ প্রসবের পক্ষে তারা অন্তরায়বিশেষ; তেমনি দু'একটী সন্তান প্রসব করা হলেই নারী সাধারণতঃই তার যৌবন-সমৃদ্ধি সেই একই কারণে হারায়।

সেইজন্য আমরা দেখি যে তরুণী নারীরা সংসারের কাজ বা যে কোনও কাজ খেলাচ্ছলেই করে থাকে—তারা যে কাজটা খুব অন্তরের সহিত মন দিয়ে করে সেটা ভালবাসা, বা পুরুষের মন জয় করা, বা ইহারই আনুষঙ্গিক কোন কাজ—যেমন সৌখীন পোষাক পরা, সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি।

কোন জিনিষ গৌরবময় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে হলেই তার বিকাশে সময়

লাগে। আটাশ বছরের পূর্ব্বে পুরুষের সাধারণতঃ বিবেকবুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তি পরিপুষ্টিলাভ করে না; নারীর কিন্তু আঠারো বছরেই এ ব্যাপারটী শেষ হয়ে যায়। এবং নারীর পক্ষে এই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ পুরুষের চেয়ে অনেক কম হয়। সেজন্য সারাজীবন ধরে' নারী শিশুই থেকে যায়; খুব কাছে যেটা আছে, বর্ত্তমানের সঙ্গে সেটা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট—এ ছাড়া তারা আর বড় বেশী কিছু দেখতে পায় না, তাই ছায়াকেই তারা কায়া বলে ভ্রম করে তুচ্ছ বিষয়কে মনে করে খুব গুরু বিষয়। পুরুষ কিন্তু এই বুদ্ধিবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির বলে ইতর পশুর মত কেবল নিকটের জিনিষই দেখে না,—সে চারিদিকে চেয়ে থাকে, তার দূরদৃষ্টি চলে যায় ভূত ও ভবিষ্যতের পানে। তাই পুরুষের চিন্তা, ভাবনা ও প্রজ্ঞার পরিণতি এত বেশী। এ সব গুণগুলি পুরুষের অনুপাতে নারীর খুবই কম। তাই যে ঘটনা আসলে ঘটেনি বা হয়ে গেছে, বা হবে—তার প্রভাব নারীর মনে একরকম নেই বললেই হয়। এই কারণে নারীরা অনেক সময় অমিতব্যয়ী; নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য তারা অনেক সময় এমন সব কাজ করে' বসে, যাতে মনে হয় যে তারা একেবারে পাগল। মনে মনে নারীরা ভাবে যে পুরুষের কাজ পয়সা উপায় করা, আর তাদের কাজ সেই পয়সা খরচ করা।—এ কাজটা স্বামীর জীবিতকালে হয়ত ভালই, নইলে স্বামীর মৃত্যুর পরে। স্বামী অর্থ উপায় করে' এনে তাদের হাতে দেয় বলেই তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এ বিষয়ে যতই মতভেদ থাক না কেন, নারীর স্বপক্ষে কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে পুরুষের চেয়ে নারী বর্ত্তমানের মোহে বেঁচে থাকতে বেশী ভালবাসে। ইহাই নারীর স্বাভাবিক প্রফুল্লতার কারণ,—এই জন্যই নারী পুরুষের আসর-বাসরে চিত্তবিনোদন করে, ও সে যখন চিন্তা ও দুঃখের ভারে অবনত হয়ে পড়ে তখন তাকে মধুর সান্ত্বনা দেয়।

বিপদের সময় রমণীর পরামর্শ লওয়া মন্দ নয়। পূর্ব্বকালে জার্ম্মানরা ইহা করত। কারণ তাদের দেখবার ভঙ্গিটী ত আমাদের মত নয়, তারা কার্য্য-সিদ্ধির জন্য যেটা সরল ও সোজা পথ সেইটেই বেছে নয়, আর যেটা চোখের কাছেই পড়ে আছে, তা'তেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করে। পক্ষান্তরে আমরা সুদূরের দিকে চেয়ে দেখি ও হাতড়ে মরি। এ বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্তটীতে পৌছিতে হলে নারীর সাহায্যই আমাদের বেশী প্রয়োজন।

একটা বস্তু বা ব্যাপারের মধ্যে যাহা প্রকৃতই বর্ত্তমান, নারী তাহাই স্পষ্ট

দেখতে পায়, আমরা কিন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়লে কোনও বস্তু বা ব্যাপার অতিরঞ্জিত ভাবে দেখে নানা দুঃখের সৃষ্টি করি।

বিবেচনাবুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃই নারী পুরুষের চেয়ে বেশী সমবেদনাপরায়ণ; অভাগা দুঃখীদের প্রতি তার বেশী করুণা। কিন্তু ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি হিসাবে সে পুরুষের চেয়ে ঢের ছোট। বিবেচনাশক্তি দুর্ব্বল বলেই বর্ত্তমানের ঘটনা সমবায় তাদের এমন করে মুগ্ধ করে রাখে; আর এই জন্যই চিংাশক্তির উন্মেষ, স্থির ব্যবহারবুদ্ধি, দৃঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ভূতভবিষ্যৎ বা অনাগত সুদূরের প্রতি অচলাদৃষ্টি—এ সব কিছুই নারীর চরিত্রে পরিস্ফুট হতে দেখা যায় না।

সুতরাং স্ত্রীচরিত্রের প্রথম ও প্রধান দোষ হচ্ছে—ন্যায়বুদ্ধির অভাব। পূর্ব্ব-প্রদর্শিত কারণ ছাড়া এর আরও একটা কারণ দেখা গিয়েছে যে প্রকৃতি তাদের দুর্ব্বল করেই সৃষ্টি করেছেন। তারা নির্ভর করে চাতুর্য্যের উপর শক্তির উপর নয়,—সেজন্যই তাদের একটা স্বভাবসিদ্ধ ছলনাবুদ্ধি আছে, যার দ্বারা তারা মিথ্যাকে সত্য বলতে একটুও ভয় পায় না। সিংহের যেমন নখদংষ্ট্রা, হস্তীও ভল্লুক যেমন তুণ্ড, ষণ্ডের সিং, কাট্‌ল্-মাছের ধূম্রবর্ণের লালানিস্রাব,—তেমনি প্রকৃতি নারীকে রক্ষা করবার জন্য দিয়েছেন,—ছলনাবুদ্ধি। পুরুষের দৈহিক শক্তি ও বিবেচনাবুদ্ধি নারীর মধ্যে এইরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। ছলনাবুদ্ধি নারীর সহজাত সংস্কার বিশেষ,—ইহাতে তার দুর্ব্বুদ্ধি ও চাতুর্য্য—দুই-ই ফুটে উঠেছে। পূর্ব্বোক্ত পশুরা আক্রান্ত হলে যেমন ঐ প্রহরণগুলি ব্যবহার করে নারীও সেইরূপ প্রতিবারেই তার ছলনাবুদ্ধি প্রকাশ করে। সে জন্য সম্পূর্ণ সত্যপ্রিয়া ও ছলনাহীনা নারী জগতে বড়ই বিরল। আবার একজন নারী ছলনাময়ী হলে' অন্য নারী তার সঙ্গে বেশ বুঝেই চলে। তাই গোড়ার এই দোষ থেকে নারী চরিত্রে নানা দোষের উদ্ভব হতে পারে, যেমন—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। আদালতে দেখা যায় যে নারীর দ্বারাই বেশীর ভাগ জাল-জুয়াচুরি অনুষ্ঠিত হয়। বিচারের পূর্ব্বে আদালতে নারীদের হলপ্-করানো উচিত কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে জগতে কোনও অভাব নেই অথচ অনেক নারী দোকান-ঘরের কাউণ্টারের উপর থেকে অন্যের অজ্ঞাতসারে জিনিষপত্র নিয়ে সরে পড়ে।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে পুরুষের মধ্যে যারা তরুণ, সুন্দর ও শক্তিমান, কেবল তারাই বংশজননের পক্ষে উপযুক্ত, কারণ তাহলে আর বংশের

ধারা দোষদুষ্ট হতে পারবেনা। প্রকৃতির এই দৃঢ় উদ্দেশ্যটী নারীর আসঙ্গ লিপ্সার ভিতরে দিয়ে বেশ ভাল করেই প্রকাশিত হয়েছে। এর চেয়ে পুরাতন বা সুদৃঢ় নিয়ম আর নেই। এ নিয়মের বিরুদ্ধে কোন পুরুষ কখনো মাথা তুলতে পাবেনা। গোপনীয় ও অপ্রকাশিত হলেও যে নিয়মটী সঙ্গোপনে নারীর মনে কাজ করে যায়, তা কতকটা এই রকম—'জনন-ক্রিয়ার দাবী নিয়ে পুরুষেরা আমাদের উপেক্ষা করে, ন্যায়তঃ তাই আমরা তাদের প্রতারিত করতে বাধ্য। আমাদের দেহ থেকেই সন্তান জন্মায়,—সন্তানের জননী বলে' আমরাই তাদের মানুষ করবো।' কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মুখ্যভাবটীর বিষয়ে নারীর কোনও ধারণা নেই। আমরা যতটা মনে করি, বিবেকবুদ্ধি ততটা তাদের মন স্পর্শ করেনা। কারণ হৃদয়ের অন্তরতম নিভৃত গুহায় তারা এই মনে করে যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিশ্বাস ভাজন হয়েও সন্তানের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য বেশ ভাল করেই তারা সম্পন্ন করেছে।

সন্তান—প্রজননের জন্যই স্ত্রীলোক বেঁচে থাকে বলে' সন্তানের উপর তাদের যতটা টান, ব্যক্তি বিশেষের উপর ততটা নেই। এজন্য সারা-জীবন ধরেই তারা একটা বুদ্ধিহীনতা দেখিয়ে থাকে। তাদের চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু তাদের নিজস্ব, এই কারণেই বিবাহিত জীবনে দম্পতীর মধ্যে এত কলহ হয়।

পুরুষের সাধারণ প্রকৃতি—উদাসীনতা কিন্তু নারীর মধ্যে এইটী প্রকৃত শত্রুতায় পরিণত হয়। পুরুষের ভিতর যে ব্যবসায়- ঈর্ষা ((odium figulinum) তাদের নিজ নিজ কার্য্যের সীমা অতিক্রম করেনা, নারীর ভিতর সেটা সমগ্র নারী জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও সংক্রামিত হয়ে থাকে। কারণ তাদের পেশা যে একই। রাস্তায় দেখা হলেও নারীরা পরস্পরের দিকে ইতিহাস-কথিত গুয়েল্‌ফ্ ও গিবেলাইনের মত ঈর্ষ্যা কটাক্ষে চেয়ে দেখে। আর একটা মজা এই—দুজন নারী পরস্পরে আলাপ হলেই বেশ সংকোচ ও ছলনার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়, এমনটা পুরুষের ভিতর হয়না। তাই দুজন পুরুষের চেয়েও দুজন নারীর ভিতর সাদর সম্ভাষণ ব্যাপারটা এত হাস্যকর। পুরুষেরা নীচু সমাজের লোকদের সঙ্গে কথা কয়বার সময় যেটুকু মান সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলে, সৌখীন রমণীরা সাধারণতঃ সেটুকু মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম রেখে কথা কয়না। তারা প্রায়ই ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাবেই কথা কয়। এরা

সোজা কারণ এই যে, তাদের চেয়ে কে ছোট কে বড়—এটা তাদের কাছে খুবই একটা বড় কথা। পুরুষের বেলায় বিবেচনা করবার অন্য শত শত বিষয় থাকে, আর নারীর বেলায় শুধু একটা - কোন্ পুরুষের সুনজরে তারা পড়তে পেরেছে। তাদের সকলের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এক বলে' সকল নারীর মধ্যেই বেশ একটা নিকট সম্বন্ধ থাকে। তাই সমাজিক পদবীর বৈষম্যের উপর তাদের বেশী করে নজর দিতে হয়।

যে পুরুষের মানসিক বুদ্ধি কামপ্রভাবে জড়ীকৃত হয়ে পড়েছে, সেই কেবল ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি, নাতিপরিসর কণ্ঠ, বিপুল নিতম্ব, ক্ষুদ্রচরণ নারীগণকে fair sex আখ্যা দিবে। স্ত্রীলোকের সব সৌন্দর্য্যই ত ঐ মোহের সঙ্গে জড়িত! তাদের 'সুন্দর' না বলে 'সৌন্দর্য্য রস বোধ হীন' (unaesthetic) বলাই সঙ্গত। গান, কবিতা, কলাবিদ্যা—এ সব প্রাণ দিয়ে বোঝবার শক্তি তাদের একেবারে নেই—যে কলাবিদ্যার 'বড়াই' করে তারা আনন্দ দিতে যায় অন্যের প্রাণে, তাহা নিতান্তই অসার। সম্পূর্ণ বস্তুগত আনন্দ (objective interest) গ্রহণ করতে তারা একেবারেই অক্ষম। পুরুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে একনিষ্ঠতা দিয়ে একটা বিষয়ের উপর নিজের জ্ঞান প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নারী এই জ্ঞানটা সর্ব্বদাই পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে থাকে—পুরুষের সাহায্য দিয়ে। মুখ্যতঃতার জ্ঞানলাভটা সর্ব্বদাই পুরুষের ভিতর দিয়ে হয়ে থাকে। অতএব নারীর ধর্ম্মই হচ্ছে সব জিনিষ এমনভাবে দেখা যাতে সে পুরুষকে জয় করতে পারে। এবং সে যদি আর কোন বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে ইহা ঐ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সেজন্য রুশোও বলেছেন 'সাধারণতঃ কলাশাস্ত্রে নারীদের কোনও :আশক্তি নেই, দখল নেই, প্রতিভা নেই।' (Lettre 'á d' Alembert, Note XX.)

একটু তলিয়ে দেখলে সকলেই এ বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারেন। কোনও কনসার্ট, অপেরা বা নাটক অভিনয়ের সময় নারীরা যেরূপ মন দিয়ে শিশুসুলভ-সারল্য নিয়ে বড় বড় বইগুলির বিখ্যাত অংশ বিশেষ নিয়ে অনবরত বকে যায়—সেটাও অনুধাবন যোগ্য। গ্রীকেরা নারীগণকে অভিনয়াগারের বাইরে রেখে ভালই করেছিল। আমাদের কালে 'গির্জ্জায় নারীরা চুপ করে থাকবে'—ইহাই অধিকতর সঙ্গত। যবনিকার উপর ঐ কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখে দেওয়া উচিত।

যখন দেখা যায় যে নারীদের মধ্যে কেহই কলাশাস্ত্রে বিশেষ কোনও মৌলিক, গৌরবজনক ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করতে পারেনি, তখনই নারীদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না—তাও বেশ বোঝা যায়। চিত্রাঙ্কণে এই ব্যাপারটি বেশ সুপরিস্ফুট হয়েছে, কারণ ইহাতে তাদের দখলটা পুরুষেরই মত; সেজন্য চিত্রবিত্তায় তারা বিশেষ অগ্রণী। কিন্তু তবুও তাদের ভাবসম্পৎ গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই বলে' গর্ব্বপ্রকাশ করবার মত তারা একখানি ছবিও এ পর্য্যন্ত আঁকতে পারেনি। বস্তুগত ধারণার বাইরে তাদের যাবার কোনই ক্ষমতা নেই তাই আর্টের দিকে সাধারণ নারীর কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই। কারণ প্রকৃতি চলে ঠিক ক্রমানুসারে—একেবারে লাফিয়ে চলে না (Non facit saltum.)। হুয়ার্ট (জুয়াল হুয়ার্ট, ১৫২০—১৫৯০, মাদ্রিদের ডাক্তার ছিলেন। শোপেন্‌হাউয়ের কথিত সুবিখ্যাত বইখানি নানাভাষায় তর্জ্জমা হয়ে গেছে) তাঁর Examen de ingenios para las scienzias নামক তিনশো বছরের বিখ্যাত পুস্তকে লিখেছেন যে উচ্চমনোবৃত্তি নারীদের কিছুই নেই। নারী জাতিটাকে সমগ্রভাবে এক করে দেখ্‌লে এ উক্তির আর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। স্বামীর দুষ্ট আকাঙ্ক্ষার আগুনে সর্ব্বদাই তারা ইন্ধন যুগিয়ে দেয়। সমাজ তাদের এইভাবের কোনও প্রতীকার করে না বলেই বর্ত্তমান সমাজের এত দুর্গতি। সমাজে তাদের স্থান যথার্থভাবে নির্ণয় করতে হলে 'স্ত্রীলোকের কোনও সামাজিক পদবী নেই'—নেপোলিয়নের এই কথাটি সার সত্য বলে মেনে নিতে হবে। তাদের অন্যান্য গুণের সম্বন্ধে শাঁফর (Chamfort) বলেন, 'তারা আমাদের দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার সঙ্গেই ব্যবসা চালাতে চায়, সদ্বুদ্ধির সঙ্গে নয়। পুরুষের সঙ্গে নারীর যে সহানুভূতি আছে, তাহা খুব নিবিড় নয়, আর তা আমাদের মন, ভাব বা চরিত্র স্পর্শ করে না।' তারা নিম্নতর শ্রেণীর জাত (sexus sequior)—পুরুষের চেয়ে অনেক নীচু। তাদের দুর্ব্বলতা তাই বিশেষ ক্ষমাশীল হয়েই দেখা উচিত। কিন্তু তাদের প্রতি একটা 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' ভাব দেখানো একেবারেই লজ্জাকর, কারণ তাতে করে তাদের চক্ষে আমাদের নীচু হয়ে যাবারই সম্ভাবনা! মানব জাতির উপর প্রকৃতিদেবী যে দাঁড়িটা টেনে দিয়েছেন, সেটা একেবারে ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে যায় নি। বিভাগটা একেবারে বিভিন্ন মুখী হয়ে,—আর এই বিভাগটা শুধু গুণানুসারেই হয়নি, মাত্রানুসারেও হয়েছে।

প্রাবীণেরা ও প্রাচ্য দেশবাসীরা নারীদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই করে-

ছিলেন, তাই নারীর যথার্থ অবস্থাটার বিষয়ে তাদের ধারণা আমাদের চেয়ে ঠিক, কারণ আমাদের মাথায় নারীপ্রেম সম্বন্ধে ফ্রান্সদেশের প্রেমকৌতুক একটা উল্টো ভক্তিভাব জাগিয়েছে। আমাদের এই ধারণা নারীদের অধিকতর উদ্ধতপ্রকৃতি ও হঠকারী করে' তুলেছে। আমাদের মনে পড়ে যায়—হিন্দুদের বারাণসীধামস্থিত পবিত্র' বানরের দল, কারণ তারা পবিত্র বলে' তাদের কেউ মরিতে সাহস করেনা, আর তারা যা-ইচ্ছে তাই করে।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নারী—বিশেষতঃ উচ্চবংশের মহিলা (lady)—একটা মিথ্যা পদ গৌরব নিয়ে আছে। প্রাচীনদের কথিত 'নিম্ন প্রকৃতির' এই মহিলারা কোন ক্রমেই আমাদের সম্মান ও গৌরব পাবার উপযুক্ত নয়, পুরুষের চেয়ে উঁচু আসন বা তার সঙ্গে সমকক্ষতার আসন পাবারও যোগ্য তারা নয়। তাদের জীবনের এই মিথ্যা গৌরবের ফলাফলটা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। অতএব সমগ্র মানবজাতির কর্ত্তব্য···এই 'নম্বর টু'—কে য়ুরোপে তার যোগ্য আসনে স্থান দিয়ে এই মহিলা-সঙ্কটের অপনোদন করাই উচিত, কারণ ব্যাপারটা শুধু সমগ্র এশিয়া মহাদেশের পক্ষে হাস্যকর নয়—প্রাচীন গ্রীশ ও রোমদেশও মহিলাদের এই দৃশ্যে হেসে খুন হত। নারীকে তার যথাযোগ্য আসন দিলে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে যে স্বাস্থ্য-কর পরিবর্ত্তন হবে, তা আমরা এখনো ভাল করে' ভাবতে পারিনি। য়ুরোপে আর Salic Law'র প্রয়োজন হবে না। য়ুরোপে এই মহিলা'র আর স্থান হবে না; সে গৃহকর্ত্রী বা আসন্ন-গৃহকর্ত্রীর পদে আসীনা হবে; তাকে আর উদ্ধত-প্রকৃতি করে' শিক্ষা দেওয়া হবে না, যাতে সে সকয়ী ও বিনয়ী—সেইমতই শিক্ষা দেওয়া হবে। তাই পাশ্চাত্য সমাজে এত দুঃখ, এত অশান্তি। লর্ড্ বায়রণ্ও বলেছেন, "প্রাচীন গ্রীকদের নারীদের সম্বন্ধে ধারণা বেশ সঙ্গতই ছিল। বর্ত্তমান ধারণা কল্পনাময় ও মধ্য যুগের বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলে' ইহা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। খাইয়ে-পরিয়ে তাদের শুধু ঘরের কাজেই মন দিতে দেওয়া উচিত,কিন্তু সমাজে কখনো মিশতে দেওয়া উচিত নয়। ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও তাদের দখল থাকা উচিত, কিন্তু রাজনীতি বা কাব্যশাস্ত্রে তাদের কোনই অধিকার নেই। ধর্ম্মপুস্তক ও রন্ধনবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক ছাড়া আর কোন পুস্তক তারা পড়বেন না। গান, চিত্রবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা, বাগান-গড়া ও লাঙ্গল-চষাও তাদের পক্ষে বেশ সঙ্গত। এপিরস্ দেশে রাস্তা তৈরি করতে আমি তাদের খুব মজবুত দেখিছি। ঘাস-তৈরি-করা ও দুধ-দোয়া-কাজেও তারা বেশ লাগতে পারে।"

য়ুরোপীয় বিবাহ-আইনে বলে, যে নারী পুরুষেরই সমকক্ষ, কিন্তু এ যুক্তিটা ভ্রান্ত। আমাদের এক বিবাহের দেশে বিয়ে করলেই যেন আমাদের দাবীগুলা আধাআধি ও কর্ত্তব্যগুলো দ্বিগুণ হয়ে পড়ে। কিন্তু আইনে যখন নারীকে পুরুষের মত সমান দাবী দিয়েছে, তখন তাদের পুরুষোচিত শক্তি ও প্রতিভা ও থাকা চাই। কিন্তু আইন নারীকে যে প্রতিষ্ঠা ও অধিকার দিয়েছে তাহা প্রকৃতির দানের চেয়ে ঢের বেশী,—আর যে সব নারী এই প্রতিষ্ঠাও অধিকার ভোগ করতে চায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। এই এক বিবাহের রীতি থেকেই নারীর এই উদ্ভট অবস্থা হয়েছে,-তাই তারা পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা করে। যে-সব পুরুষেরা তীক্ষ্ণধী ও প্রাজ্ঞ, তারা এক বিবাহের এই কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়তে খুবই ইতস্ততঃ করে থাকে।

বহুবিবাহের দেশে প্রত্যেক নারীই একটা আশ্রয় পায়, কিন্তু একবিবাহের দেশে বিবাহিতা নারীর সংখ্যা খুবই কম। এখানে একদল নারী থাকে—যাদের আশ্রয়ও নেই, অবলম্বনও নেই; সমাজের উচ্চস্তরে থাকলে তারা অনাবশ্যক 'বৃদ্ধা অবিবাহিতা বালিকা' (old maids) হয়ে থাকে, নিম্নস্তরে থাকলে কঠিন পরিশ্রমে মারা যায়, কিংবা বারবিলাসিনী হয়ে (filles de joie) জীবনের আনন্দ ও গৌরব—দুই-ই হারায়। কিন্তু অবস্থাচক্রে তারা একটা 'আবশ্যক' হয়ে দাঁড়ায়; তাদের স্থান সকলেই স্বীকার করে নেয়, কারণ তারা থাকলে যে সব নারীরা বিবাহিত বা আসন্ন বিবাহিতা, তাদের উপর লোকে আর নজর দেবে না। এক লণ্ডনসহরেই ৮০,০০০ এর উপর বেশ্যা আছে। একবিবাহের আইনে পড়েই ত তারা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। শোচনীয় অবস্থাপন্না এই সব নারীরা য়ুরোপের উদ্ধতপ্রকৃতির মহিলাদেরই উণ্টা ছবি। এইজন্য বহুবিবাহ—প্রথা সমাজে নারীর পক্ষে একটা কল্যাণ। অন্যদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে যার স্ত্রী চিররুগ্না, বা বন্ধ্যা বা বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়েছে, তার দারান্তর—গ্রহণে আপত্তি কি? এই কারণেই অনেকে Mormonism—এর আশ্রয় নিয়ে থাকে।

অধিকন্তু নারীকে এই অস্বাভাবিক দাবী দেওয়ার ফলে তার স্কন্ধে কতকগুলি অস্বাভাবিক কর্ত্তব্যও এসে পড়েছে, আর এই কর্ত্তব্যসমূহ পালন না করায় সে নিজে অসুখী হয়ে পড়েছে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। খুব বড় ঘরে বিয়ে না করলে তার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার যে একটা বিপর্য্যয় ঘটবে—পুরুষে এই কথাটাই প্রায় ভেবে থাকে। সে জন্য সে বিয়ের দায়ে ধরা না দিয়ে